বিংশ শতাব্দী

—কয়েকটি মতামত—

প্রবাসী বলেন :···বিংশ শতাব্দীর বিশ্লেষণী মনের সাক্ষাৎ লেখক পাইয়াছেন।···

সুসাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায় মহাশয় বলেন :

···আপনি গল্প জমাতে জানেন। এটা সম্ভব জাত-ঔপন্যাসিকের পক্ষেই।···সবচেয়ে বড় কথা জীবনের সঙ্গে আপনার চাক্ষুষ পরিচয় আছে।···

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন :···বিংশ শতাব্দীর ···সমস্যা ইহার পটভূমিকা। লেখকের ভাষা ঝরঝরে। গল্প বলিবারও শক্তি আছে।···

শিশির সেন

বিংশ শতাব্দী

শিশির সেন

প্রাপ্তিস্থান
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক :—শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত
১।১০, রূপচাঁদ মুখার্জি লেন
কলিকাতা

মূল্য—দেড় টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দিদিমা ও দাদুকে

১৮. ২. ১৯৪২.   শিশির সেন

সম্পূর্ণ নোতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিংশ শতাব্দীর তরুণ-তরুণীর মনোবিশ্লেষণ। কথা তাদের ছন্দে লীলায়িত, শব্দ-বিন্যাসে কৌশল, ভাবনা তাদের দিগন্ত জোড়া···শুধু প্রেম নিয়ে তারা তৃপ্ত নয়···তবে তারা কি চায়?

শ্রেণীহীন সমাজ? এ-কি কখনও সম্ভব! না এ-ও মানুষের একটা জাগ্রত স্বপ্ন—যার সুরভি আছে, অথচ সত্ত্বা নেই···

প্রথম সংস্করণ---ফেব্রুয়ারী ১৯৬২

বিংশ শতাব্দী

বিংশ শতাব্দী

দুপুরের ঝিমিয়ে পড়া অলস আবহাওয়াকে সজীব করে তুলচে সংকীর্ণ গলির এক সংকীর্ণতর রেস্তোরাঁ। য়ুনিভার্সিটি কলেজের খুব কাছেই, অথচ রেস্তোরাঁটি যন্ত্র-সভ্যতার তাণ্ডবতা বাঁচিয়ে যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করেচে। এখানকার অভিনয়কারীরা ভিড় করে, প্রথম মধ্যাহ্নের পরে এক কাপ চায়ের উপর সিগারেটের পর সিগারেটের ধূম্র কুণ্ডলি রচনা করে অতি সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব ফেঁদে।

এই রেস্তোরাঁরই একটি টেবিল ঘিরে তিনটি যুবক বিনা বাক্য ব্যয়ে পরম নিশ্চিন্ত মনে মাঝে মাঝে এক চুমুক চা পান ও সিগারেটের ধুঁয়ো ছুড়ে দিচ্ছিল শূন্যে। যুবক তিনটি পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। এদের পরিচয় যথা সময়ে জানা যাবে। এখন শুধু নাম জেনে রাখলেই আখ্যায়িকার কাহিনী বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট।

উৎসাহ গুপ্ত, মিথিলেশ মিত্র আর কৌস্তুভ সেন।

নীরবতা ভঙ্গ করে মিথিলেশ প্রথমে কথা বলে, কোন মতবাদই সত্য নয় বন্ধু। আজ যাকে সত্য বলে মনে করচ কালই তাকে একটি মারাত্মক ভ্রম বলে মনে হবে। আর স্বব মতবাদ মানবই বা কেন! নিজের বিবেক বুদ্ধির সঙ্গে যাচাই না করে অন্ধবিশ্বাসে ভর করে সবকিছু যদি মেনে নি, তবে আর গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে চীৎকার করে লাভ কি? ডিক্টেটরগিরিরই তাহলে জয় জয়াকার।

উৎসাহ উত্তেজিত হয়ে বলে, তোমার ষোড়শ শতাব্দীর চিন্তাধারা বিংশ শতাব্দীতে অচল। কম্যুনিষ্ট, ফ্যাসিষ্ট বা সোস্যালিষ্ট—এই তিন দলের কোন এক দলে না যোগ দিয়ে আজকালকার ছেলের পক্ষে বাঁচা অসম্ভব, অসম্ভব,

কৌস্তুভ স্বভাবতই স্বল্পভাষী। অধিকন্তু দরিদ্রতা-রূপ পাপ তার জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জড়িয়ে আছে। বর্তমানে উৎসাহদের বাড়ীতে গৃহ-শিক্ষক হিসেবে তার বোনকে পড়ায়—পরিবর্তে পায় আহার ও বাসস্থান।

কৌস্তুভ মুস্কিলে পড়ে যখন উৎসাহ তার দিকে তাকিয়ে সমর্থন চায়। উত্তরে কৌস্তুভ মৃদু হাসে।

উৎসাহ বলে, তোমার হাসলে চলবে না, উত্তর দিতে হবে।

সুযোগ পেয়ে মিথিলেশ বলে, এধারে সাম্যবাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, ওধারে বুর্জোয়া শ্রেণীর চিরন্তন হুমকি। তুমি কি জুলুম করবে নাকি? তোমার বাসায় থাকে বলেই ওর উপর এত অত্যাচার। অসহ্য—ও যদি ওর মতামত রিজার্ভই রাখে তা'হলে তোমার উষ্মা প্রকাশ করবার কিছু নেই।

শান্তকণ্ঠে উৎসাহ জবাব দেয়, তুমি যে আমায় এমন হীনভাবে আক্রমণ করবে তা' আমি মোটেই ভাবতে পারি নি। নেহাৎ বন্ধু বলেই তোমায় ক্ষমা করলাম, নইলে এর প্রত্যুত্তর যে কি ভাবে দিতে হয় তা দেখিয়ে দিতাম।

কৌস্তুভকেই সূত্র ধরে আলোচনা ঘোরালো হয়ে উঠচে দেখে সে মনে মনে অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে ওঠে। তখন কৌস্তুভ বলে, আমি লজ্জিত যে আমাকেই কেন্দ্র করে তোমাদের আলোচনা এমনি একটি বিশ্রী অবস্থায় এসে পৌঁছেচে। আমার মতামতের মূল্য যে কতটুকু তা' ত আমার অজানা নেই। সেজন্যই এতক্ষণ শব্দ করিনি।

উৎসাহ বলে, এ তোমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার একটা

সহজ উত্তর। নিজেকে তুমি যত ছোট ভাব আসলে ত তুমি তা' নও। মানুষে মানুষে এই যে পার্থক্য বা ভেদ একেই বর্জন করতে হবে। তুমি ত আমার সহপাঠী বন্ধু। আমাদের ভিতরেই যদি এতটা বিভেদ তবে আর অপর লোকের কথায় প্রয়োজন কি!

কৌস্তুভ বলে, তবে শোন: কোন মতবাদই অখণ্ড সত্য নয়। ক্ল্যাসিকাল জিনিষটি বোঝ ত—এই যেমন ভাব আর বস্তুর সমন্বয়—উভয়ের ভিতরে একটা সাম্যভাব একেই বলে ক্ল্যাসিকাল। মতবাদকে যদি গ্রহণ করতেই হয়, তবে এভাবে গ্রহণ করলে ক্ষতি কি—একদিকে নিজের ব্যক্তিগত চিন্তাধারা, বিচার বুদ্ধি অপর দিকে মতবাদ। এদের ভিতরে একটি সমন্বয় বা সাম্য রেখে যে অংশটুকু বাঁচবে তাকে গ্রহণ করলে জীবন সচল রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।

মিথিলেশ টেবিলের উপরকার পেয়ালা ও পিরীচের ঝন্‌ঝনানি শব্দ করে চীৎকার করে বলে, হিয়ার, হিয়ার।

উৎসাহ শব্দ করে না।

মিথিলেশ পুনরায় তার কথার জের টেনে বলে, সত্যি কথা বলতে কি উৎসাহ, তুমি রাগ কর আর যাই কর আসল কথা হচ্চে যতদিন ছাত্র আছ ততদিনই

মতবাদ। তারপরে কে কোথায় ছিটকে পড়বে তার কি কিছু ঠিক আছে! কেরাণীগিরির জোয়াল একবার ঘাড়ে চাপলে সব মতবাদই দু' দিনে উবে যাবে। অল্ ইণ্ডিয়া সার্ভিস পেলে অবশ্য মতবাদ সমর্থন করা তাও বা কিছুটা সম্ভব। অন্যদের কথা আর বোল না, আমি অনেক দেখেছি। আর তোমার ত চাকরীর বালাই নেই, তোমাকে সবই সাজে।

উৎসাহ নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, বাই জোভ—পাঁচটা বাজে। আজ ত ছ'টার সময় মিটিং হাজরা-পার্কে। কৌস্তুভ মিটিংএ যাবে না, কারণ তার সময় নষ্ট হবে। আর মিথিলেশ তুমি, ব্যুরক্রেট পুত্র তোমাকে কি কৃষাণ মজদুরের সভায় যাওয়া চলে! তুমি বরং মেট্রোতে গিয়ে 'দি গ্রেট্ জিগফিল্ড' দেখে এসো।

মিথিলেশ একটু হেসে উত্তর দেয়, এতদিন জানতাম তুমি সেকেণ্ড লাইট পেয়েচ, এখন দেখচি সারমন্ দিতেও জান।

উৎসাহ যখন সভা শেষ করে বাড়ী ফিরলে তখন রাত ন'টা। সভা হতে বাড়ী পর্য্যন্ত সারাটা পথ ওর মাথার ভিতর বহুসমস্যার ভিড় এসে জমে। বুকের দ্রুত স্পন্দনে ও উত্তেজনায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে:

শ্রেণীহীন সমাজ? সত্যি এও কি কখন সম্ভব হবে! মুষ্টিমেয় ধনীর অঙ্গুলি হেলনে এই যে অগণিত বুভুক্ষু কৃষাণ ও মজতুর জীবন-মরণ তুচ্ছ করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেচে—এদের ভিতরে একটা সাম্য বা সামঞ্জস্য এও কি কখনও সম্ভব! না এও মানুষের একটা জাগ্রত স্বপ্ন—যার সুরভি আছে অথচ সত্ত্বা নেই।

বাড়ীতে পা দিতেই মা'র কাছ থেকে পরোয়ানা এল। মা'র কাছে ঠাকুর মা'ও বসে ছিলেন। দুজনে একসঙ্গে পরামর্শ করে তলব পাঠিয়েছেন দেখে উৎসাহ একটু আশ্চর্য্য হয়; কারণ মা ও ঠাকুরমা দুজনে এভাবে কখনও ডাকেন না।

মা বললেন, ভরতখালি থেকে কতগুলি উচ্ছৃঙ্খল প্রজা কোলকাতায় এসেচে তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে। নায়েববাবু বললেন, ব্যাটারা নিজেরা ত খাজনা দিবেই না—ওদিকে গ্রামকে গ্রাম ক্ষেপিয়ে তুলচে প্রজা আন্দোলন করে।

উৎসাহের মনে হল: হায়রে absentee Landlords! নিজেদের বিলাস ব্যসন ও উদর পূরণ করতেই যারা ব্যস্ত, তারা আবার প্রজার মঙ্গলের জন্য কি করবে!

মা বললেন, তারপর শোন : লাটের কিস্তি সামনেই, আর বেশী দেরী নেই। গত কিস্তির খাজনা আজ অবধি দেওয়া হয়নি, আবার এবারেও যদি বাকী পড়ে তবে জমিদারী রক্ষা করা দায় হয়ে পড়বে। তোমাদের বংশ পরম্পরার যে পুণ্যস্মৃতি এই জমিদারীর সঙ্গে জড়িত তার কথা স্মরণ করেও তোমাকে তদ্বির তাগাদা করে উদ্যোগী হওয়া উচিত।

উৎসাহের মনে হয় : Our birth is an accident, ভাগ্যক্রমে জমিদারের ঘরে জন্মেচি বলেই নিরন্ন, অসহায় কৃষকের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে স্বেচ্ছাচারের রথ চালাব তারই বা কি মানে আছে! হৃদয়ের দাবীকে উপেক্ষা করে স্বৈরাচারের উচ্ছৃঙ্খল মত্ততা—মানুষের জন্য শাসন, না শাসনের জন্য মানুষ! লাটের কিস্তিই বড় হলো আর মানুষের অভাব অভিযোগ, সুখ দুঃখ—এর কি কোন মূল্যই নেই।

ঠাকুরমার ইঙ্গিতে মা পুনরায় আরম্ভ করলেন, আর একটা কথা নিজেকে এত খেলো করবার প্রয়োজন নেই। প্রজারা এসেচে বলে যে এক্ষুণি তোমাকে দেখা করতে হবে তা' নয়। জমিদারের সময়ের মূল্য আছে, কাল সকালে দেখা করলেই চলবে। যাও তুমি এখন বিশ্রাম করতে যেতে পার।

উৎসাহ প্রস্থান করলে ঠাকুরমা বলেন, বৌমা কথা আরম্ভ করে আসল কথাই ভুলে গেলে।

উৎসাহের মা লজ্জিত হয়ে পুত্রের অনুসরণ করে।

উৎসাহ সিঁড়ি দিয়ে শয়ন ঘরে উঠবার সময় মা তাকে বলেন, শোনঃ যে কথাগুলো তোমায় বললাম এগুলি আমার নিজের নয়। তুমি এখন বড় হয়েচ, তোমার নিজের বিচার করবার ক্ষমতা জন্মেচে—নিজে ধীর স্থির ভাবে ভেবে চিন্তে যা উপযুক্ত বুঝবে, তাই করবে। অনাবশ্যক ভাবাবেগে বা আমার কথায় নির্ভর করে কোন কিছু করবার জন্য তোমায় প্ররোচিত করচি না।

মায়ের মুখে উৎসাহ কথাগুলো শুনে মনে অনেকটা সাহস ও বল পায়। মুহূর্ত পূর্বে হৃদয়ে যে গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়েছিল তা' ক্ষণিকের ইন্দ্রজালে অপসারিত হয়।

পুত্রের মুখের প্রসন্নতায় মা সাহসে ভর দিয়ে বলেন, অবিনাশবাবু এলাহাবাদ হতে চিঠি লিখেচেন। বোশেখের প্রথমেই যাতে বিয়েটা হতে পারে।

মনের অপরিসীম তৃপ্তিতে উৎসাহের মনে হয় মা'কে যেন আজ পৃথিবীর আরও অনেক বৃহৎ জিনিষ দিয়ে দিতে পারে। সামান্য বিয়ে করে মা'কে খুশী

করা এত কিছুই নয়। কাজেই সানন্দে বলে, তোমার মতই আমার মত, তুমি যা' ভাল বুঝবে তাই আমি করব।

মাতা পুত্রের সম্মতিতে বুকভরা আনন্দ নিয়ে প্রস্থান করেন।

দুই

রাত বোধহয় বারোটা বেজে গেচে। শুক্লা ত্রয়োদশীর আবেশ বিহ্বল রূপালি চাঁদের আলোয় দিগন্ত উদ্ভাসিত। এমন দিনে বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুমোতে মন চায় না। গাছের পাতায় পাতায় চাঁদের আলোর লুকোচুরি, মাথার উপরে সুনির্ম্মল আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘের শোভাযাত্রা, দূরে নামহারা উড়ন্ত পাখীর মিষ্টি স্বর মনে অপূর্ব্ব মাদকতার সৃষ্টি হয়। মনে হয় নিরুদ্দেশের পথে যাত্রার এমন শুভমুহূর্ত বুঝি বা আর কখনও হবে না।

কৌস্তভ অনেকক্ষণ বসে বসে একা একা বাঁশী বাজায়। তারপর একসময় নিজের অলক্ষ্যেই বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। টুকরো টুকরো কথা মনের ভিতর প্রতিধ্বনিত হয়। সামান্য কথাই এত সুরে, এত ব্যঞ্জনায়—তাকে আন্দোলিত করে তুলবে তাই কি সে জানতো!

নীলা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে অনেক কথা বলে যায়। নির্ব্বাক শ্রোতা হয়ে কৌস্তভ শোনে। কিন্তু আজ নীলাকে পড়াতে পড়াতে সে হঠাৎ অস্বাভাবিক উত্তেজিত হয়ে ওঠে। Goldsmithএর Deserted village পড়াচ্ছিল:

Ill fares the land, to hast'ning ills a prey,
Where wealth accumulates and men decay.

নীলা স্তব্ধ হয়ে যায়। ভেবে পায় না এর ভিতর এত কি আছে ? যে মানুষ পাথরের মত নিশ্চল—তার কেন এ অহেতুক উত্তেজনা। কতগুলি শব্দের মোহে কেন মানুষকে এমন পাগল করে তোলে !

নীলার বিস্ময় বিমূঢ়তার দিকে দৃষ্টি পড়ায় কৌস্তভ হেসে হাতের বইখানা একপাশে রেখে বলে, এসব জিনিষ উৎসাহ—তোমার দাদাই একমাত্র ভাল বোঝেন ও বোঝাতে পারেন ! আমি ভাল বুঝি না !

নীলা অনুযোগের সুরে বলে, আপনি আবার বোঝেন না। শুধু বসে বসে রাতদিন কি যে ভাবেন সে আপনিই জানেন।

কৌস্তভ ভাবে : আমার ভাবনার চিলেকোঠায় তুমি কি পৌঁছুতে পারবে নীলা ! কি যে ভাবি আর কি যে না ভাবি সেকথা ত তোমায় বোঝাতে পারব না। সময় সময় নিজের অগোচরে নিজেই যে কোথায় চলে যাই—তা' নিজেই জানি নে।

প্রকাশ্যে কৌস্তভ একটি দীর্ঘ 'হুঁ' বলে প্রশ্নের জবাব দেয়।

নীলা বলে, বুঝেচি বাড়ীর কথা ভাবচেন। আচ্ছা, বলুন না আপনার বোনের কথা। করবী আমারই সমবয়েসী, না ?

কৌস্তুভ হেসে বলে, পাগল—আমরা হচ্ছি মফঃস্বল শহরের লোক তার ওপরে গরীব, আমাদের আবার কথা। তোমরা আমাদের উপদেশ দেবে, আমরা শুনবো। আমাদের হাসাবার কাঁদাবার সোনার কাঠি রূপোর কাঠি তোমাদেরই মত মুষ্টিমেয় টাকাওয়ালা লোকের হাতে। বৈচিত্র্যহীন জীবনে তোমরাই মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যের সীমারেখা টেনে দেও, তাই আমরা বেঁচে আছি।

অনুশোচনার সুরে নীলা বলে, কেন নিজেকে মিছেমিছি কাল্পনিক ছোট ভেবে একজন পেসিমিষ্ট্ হয়ে ওঠেন, এর গূঢ় রহস্য আপনিই ভাল জানেন!

কৌস্তুভ বলে, রাগ করো না নীলা! কোন ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করে আমি কিছু বলিনি। যা কিছু বলেচি সমষ্টিকে লক্ষ্য করেই বলেচি।

নীলা ভিতরের অবরুদ্ধ অশ্রুকে গোপন করতে গিয়ে অনুনাসিক বিকৃত স্বরে এই কথা কয়টি বলে উঠে যায়, যান—আমি আপনার সঙ্গে কোন কথা বলতে চাই নে।

নারীমনের গভীর গহনে প্রবেশ করবার প্রচেষ্টা বা অবকাশ কোনদিন সে করেও নি আর পায়ও নাই। এই বিচিত্র প্রদেশের অনাস্বাদিত রহস্যতা উন্মোচনে যে অপূর্ব্ব মত্ততা আছে তা' সে বুঝতে পারে। মান

অভিমানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব নিয়ে নারী ও পুরুষের নিবিড়তা পরস্পরকে প্রগতির আলোড়নে উভয়ের সম্বন্ধকে সুদৃঢ় ও জমাট করে তোলে। সেই আদিম যুগের সত্য নিজ নিজ জীবনের উপলব্ধিবোধে আবার নোতুন আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে—পুরাতনের মধ্যে নোতুন জন্ম নেয়—নোতুনের সহস্রমালার ঔজ্জ্বল্যে বিবর্ণ অতীত আত্মগোপনের পথ পায় না।

সত্যি নীলা চলে যায়। চিরন্তনী নারীর পুরুষকে কৌশলে আঘাত করবার সনাতনী ইচ্ছাই প্রকাশ পায় এই চলে যাওয়ায়। কিন্তু কেন? মনকে বিশ্লেষণ করে যা' পাওয়া যায় সেখানে ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া অসম্ভব। ভাবাবেগের যে একটি স্বতন্ত্র মোহ আছে সে কথা সত্যি; কিন্তু দায়িত্বকে উপেক্ষা করে যে ভাবাবেগ তাকে কোনমতেই অনুমোদন করা চলে না। দায়িত্ব—দায়িত্ব কি? পিতার অবিমৃষ্যকারিতাকে যদি দায়িত্ব নাম দিয়ে নিজ জীবনের সকল শুভ ও সুখকর সম্ভাবনাকে বিসর্জন দিতে হয়, তাহলে নিজেকে প্রবঞ্চনাই করা হবে।

মনের সুবুদ্ধি তখন প্রশ্ন করে, ছোট ছোট ভাইবোনের প্রতি কি তোমার কোন স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা নেই? শুধু কি কর্তব্যের খাতিরেই তুমি তাদের স্নেহ কর, ভালবাস?

উত্তর পায়, না—না—না; ঠিক তা'ত নয়। স্নেহ,

প্রীতি, ভালবাসা নিয়েই গড়ে উঠেচে মানুষের সমাজ ব্যবস্থা। স্নেহ প্রীতিকে অস্বীকার করলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করা হবে। আমি আমার ভাই বোনদের ভালবাসি, তাদের ফাঁকি দিয়ে আমি চুপি চুপি কোন আনন্দই পেতে চাই নে।

প্রশ্ন হয়, প্রকৃতিকে তুমি অস্বীকার করবে কি করে? তোমার ভাই বোনের একে অন্যের যে বয়সের ব্যবধান তার সমন্বয় করবার জন্য প্রকৃতি দেবী অপেক্ষা করবেন না। তুমি তোমার ছোট ভাই বা বোনকে ভালবাস বলেই যে তোমার যৌবন তাদের যৌবন না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবে—তা তুমি ভেবো না। প্রকৃতির কাজ সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করা—তার কাজ ফুরোলেই সে পালাবে। হৃদয়ের দিকে তাকাবার সময় কোথায়?

—তাইত, তবে সমাজ ও মানুষের ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য কোথায়? মনকে প্রবোধ দেবার জন্যই কি শুধু এই ব্যবস্থা? যেমনি পটভূমিকার অন্তরালে ভগবানকে না মেনে নিলে মানুষের মনে শান্তি নেই।

নীলা পুনরায় ফিরে আসায় অগোছাল চিন্তা থেকে কৌস্তুভ মুক্তি পায়। এবারে নীলাকে বেশ প্রসন্নই দেখা যায়। নীলা প্রশ্ন করে, কবে বাড়ী যাচ্ছেন? সারাটা গ্রীষ্মের ছুটীই কি সেখানে কাটাবেন?

কৌস্তুভ বলে, ছুটী হলেই বাড়ী যাব, আর ছুটী না ফুরোলে যে বাড়ী থেকে ফিরবো না সেকথা বলাই বাহুল্য। কারণ আমার জন্য সেখানে অনেকে অপেক্ষা করে আছেন।

—অনেকে কে কে ?

—কেন, আমার মা, বাবা—ভাই বোনেরা।

—আর এই বেলা আমাদের ভুলে যাবেন তাইত !

—বছরের বেশীর ভাগ সময়ই তোমাদের কাছে থাকি। ভুলবার অবসর কোথায় ?

—সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষা এবছরই দিচ্ছেন ত ?

এমনি ধরণের টুক্‌রো টুক্‌রো কথা স্মৃতির পর্দ্দায় প্রতিফলিত হয়ে সবাক বাণীচিত্রের মত সঙ্গীত মুখর হয়ে ওঠে। বহু অর্থহীন কথাও অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত হয়ে নামাহারা ফুলের মত সৌরভ বিতরণ করতে থাকে। কল্পলোকে আশা দ্রুত পদবিক্ষেপে শত হস্তীর বল নিয়ে ধাবিত হয়। রাত্রি শুভ্র চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত—দিগন্তের চক্রবালে তারার দলের হাতছানি—উদ্‌ভ্রান্ত পথিক আশার কুহকে মশগুল—আকাশে বাতাসে যাদুমন্ত্র—সৌন্দর্য পিপাসুর মনে মাদকতা—কৌস্তুভ ধীরে ধীরে নিদ্রাদেবীর কোলে এলিয়ে পড়ে।

তিন

ভরতখালি হতে যে সব প্রজারা কাছারী বাড়ীতে অপেক্ষা করছিল, উৎসাহ তাদের সঙ্গে দেখা করে। প্রজারা সংখ্যায় প্রায় জন পঞ্চাশেক হবে। উৎসাহের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে প্রজারা যথারীতি দণ্ডবৎ জানায়। এই প্রথাটা উৎসাহের বিশেষ মনঃপুত নয়, কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের শিষ্টাচারের যতটা প্রয়োজন এ প্রথা তার চাইতেও অনেকটা বেশী। মানুষে মানুষে যে স্তর বৈষম্য, উঁচু নীচু পার্থক্য ভেদ এই প্রকার আচরণে তা' আরও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মনে অভিযোগ থাকলেও বাইরে প্রকাশ করা চলে না। নিকটেই নায়েব ও গোমস্তারা সবাই অপেক্ষা করচে, কাজেই আর কিছু বলা চলে না।

উৎসাহ ধীরভাবে প্রশ্ন করে, তোমরা সবাই দল বেঁধে আমার কাছে এসেচ কেন? জমিতে বাস করলে যে জমির খাজনা দিতে হয় সেকথা আমায় বলে দিতে হবে!

প্রজাদের মধ্যে একজন মুখপাত্র হয়ে বলে, হুজুর, খাজনা দিতে আমরা কখনও না বলি না। আপনার

আমলাদের তহুরি দস্তুরি, ফাজিল পয়সা সবই এতদিন বিনা প্রতিবাদে দিয়ে এসেচি ; কিন্তু বর্ত্তমানের অবস্থা আরও সংকটপূর্ণ—তাই হুজুরের কাছে আমাদের নালিশ—

উৎসাহ বলে, কিন্তু আমি ত শুনি তোমরা খাজনা দেও না···

হুজুর, অধমের বেয়াদপি মাপ করবেন—আপনারা আমাদের থেকে অনেক দূরে বসে আছেন—আসল অবস্থা আপনারা চোখে দেখেন না—বিচার করতে হয় আপনাদের লোকের কথা শুনে—সত্য মিথ্যায় জড়িত হয়ে যে সংবাদ আসে তারই উপর নির্ভর করে—

যে প্রজাটি কথা বলছিল তারই পাশে আর একটি প্রজা এসে দাঁড়িয়ে বলে, হুজুর আমরা ছোটলোক, গরীবলোক কিন্তু আমাদেরও মান ইজ্জত আছে। বিনা প্রতিবাদে আমরা টাকা এতদিন জুগিয়ে এসেচি, কিন্তু যেদিন থেকে তহশীলদারের নজর আমাদের ঘরের মা-ভাই বোনের উপর পড়চে তখন থেকেই আমরা তার হুকুমকে অমান্য করেচি—আমাদের অপরাধ—এই-খানেই—সব কথা শুনে হুজুরের যা বিচার হবে, তা মাথা পেতে নেবো—কর্ত্তা যতদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর হুকুম কখনও অমান্য করিনি—আপনারও করব না—

উৎসাহ বলে, বল তোমাদের কি অভিযোগ—

হুজুর, খাজনা আমরা সময়মতই দেই। এবার আমরা দল বেঁধে খাজনা বন্ধ করবার চেষ্টা চালাচ্ছি এবং তার বিশেষ কারণ আছে—

ভরতখালি থেকে মাইল দশেক দূরে সুন্দরগঞ্জে এক জাগ্রত দেবীর অভ্যুত্থান হয়েচে। দেবীর এমনই মাহাত্ম্য যে, যে কামনা নিয়ে যায় তা' থেকে বঞ্চিত হয় না। গ্রামের মেয়েদেরই ভিড় হয় সেখানে। দল বেঁধে তারা যায়। হয়ত দশজন মেয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুরুষ রক্ষী যায় একটি। পায়ে হেঁটেই বেশীর ভাগ লোক যায়। তবে যারা একটু সঙ্গতিপন্ন তারা গরুর গাড়ীও ব্যবহার করে।

সুন্দরগঞ্জে কুমারী মেয়েদের ভিড় বেশী ; কারণ মায়েরা কন্যাকে সৎপাত্রস্থ করবার জন্য মেয়ের হাতের অর্ঘ্য নিবেদন করে দেবীর চরণে। প্রথম দিকে এ যাতায়াতে কোন বাধাই ছিল না! কিন্তু সম্প্রতি তহশীলদারের অত্যাচারে সরল গ্রামবাসীরা দেবীপূজার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

পাঁচটি কুমারী মেয়েকে তহশীলদারের পরামর্শে কতিপয় দুর্বৃত্ত বেমালুম গুম্ করেচে। তাদের খোঁজ আজ অবধি পাওয়া যায় নি। এ দুর্ভাগাদের সব

অত্যাচারই সহ্য হয়, কিন্তু 'ইজ্জতে যখন ঘা' লাগে তখন আর কোন কিছুই মানতে চায় না।

হুজুরের কাছে আমরা বিচার প্রার্থী—আমরা বিচার চাই।

ব্যাপারটা শুনে উৎসাহ বলে, তোমরা চঞ্চল হয়ো না, শীগ্ গীরই আমি নিজে গিয়ে সব ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়ে আসব।

হুজুরের কাছে আমাদের আর একটি আব্দার—তহশীলদারবাবুকে কাজ থেকে বরখাস্ত করতে হবে।

প্রয়োজন হলে সবই করব। এতদিনই যখন অপেক্ষা করলে তখন আর ছুটো দিন ধৈর্য ধরো।

হুজুর বাহাদুরের জয় হোক্—বলে প্রজার দল প্রস্থান করে।

* * * *

উৎসাহ আর কৌস্তুভ কলেজ রেঁস্তারায় বসে চা' খাচ্ছিল পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে। তাদের কাছ থেকে হাত পাঁচেক দূরেই মিথিলেশও অপর ছুটি ছেলের সঙ্গে চা-পান ও অত্যন্ত বাগ্মিতার সঙ্গে গল্প করছিল। মিথিলেশকে দেখে মনে হচ্ছিল পৃথিবী হতে দুঃখ বলে জিনিষটি যেন বহুদিন হতে বিদায় নিয়েচে। এখানে আছে শুধু প্রচুর আনন্দ, হাসি আর গল্প।

চুপ করে থাকলেও উৎসাহ ও কৌস্তুভ দুজনেরই মিথিলেশের গল্পের দিকেই মনোযোগ ছিল। মিথিলেশ, উৎসাহ এবং কৌস্তুভকে দেখেও দেখলে না। সে মেয়েদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গল্প করছিল। এই গল্পের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে জুড়ে দিয়ে গল্পকে আরও সরস করে তুলছিল। ব্যাপারটা মাত্র কালকেই ঘটেচে। কাল ছটার শো'তে সিনেমা দেখতে গিয়ে মীনা রক্ষিত যে দুর্বলতার পরিচয় দিয়েচে তা' নিজের জীবনে না ঘটলে কখনও বলে বোঝান যায় না। জনপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের উজ্জ্বল আলো যখন মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে আসে তখন পর্যন্ত মীনার কোন চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায় নি; কিন্তু যখন অন্ধকারের নিবিড়তা চোখে সয়ে গেচে ঠিক এমনি এক সময় মীনা···

মিথিলেশের টেবিলে যে ছেলে দুটি বসে গল্প শুনছিল তারা উভয়েই সমস্বরে চীৎকার করে বলে, বাপস্ঃ বলেই ফ্যাল না···কেনই বা বলতে গিয়ে এমনি আধখাওয়া করে রাখিস্—অনাবশ্যকভাবে curious করে লাভ কি?

মিথিলেশ জবাব দেয়, তোমাদের লাভ না হলেও যিনি গল্প বলেন শ্রোতাদের curious করে তোলাতেই তাঁর পরম আনন্দ। সত্যি কথা বলতে কি তোমাদের

curious করে তুলে যে আনন্দ পেলাম, মীনার দুর্বলতায়ও তা পাই নি।

এদিকে এবার উৎসাহ কৌস্তুভকে লক্ষ্য করে বলে, কি ভাই, কেমন বোঝ ?

বুঝবার আর কি আছে, নিজ কাণেই ত শুনতে পাচ্চ।

না আমি বলচি মিথিলেশের আমাদের প্রতি এত ঔদাসীন্যের ভাব কেন ?

কি করে বলব বল, একবার ডাক না ওকে।

মন্দ নয়—এই বলে উৎসাহ মিথিলেশকে ডাক দেয়।

গালভরা হাসি নিয়ে এসে মিথিলেশ ওদের টেবিলের কাছে একটা চেয়ার টেনে বসে বলে, কি ভাই—কেন ?

উৎসাহ বলে, আমরা কি পাপ করলুম ? গরীবের দিকে একটু নজর দিও।

বিনয় প্রকাশে দরকার নেই। নজর দেবার ইচ্ছেই চিরকাল ছিল, কিন্তু সম্প্রতি আমাদের মেলামেশা যাতে না হয় সে জন্য ঈশ্বর বাদ সেধেচেন।

উৎসাহ বলে, হেঁয়ালি রেখে ব্যাপারটাকে আরও একটু পরিষ্কার করে বলো।

বিষয়টা খুবই সরল ও পরিষ্কার। বাবা রাগারাগি করেচেন—এমন কি মীনার বাবাও আমাদের উভয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে আমাকে নিজে অনুরোধ করেচেন।

কি অনুরোধ করেছেন ?

বলেচেন—আমি যে তোমার সঙ্গে মেলামেশা করি সেটা কোনক্রমেই ভাল নয়। কারণ তোমার মত পূর্ব-পুরুষের সম্পত্তি ত আমাদের নেই। একমাত্র চাকুরীই যার ভরসা বা উপজীবিকা তাদের কি এসব চলে! ধন্যবাদ মীনার পিতাকে আর আমার বাবার অতি সাবধানী দৃষ্টিকে। সত্যি আমারও যে কি রকম মতিভ্রম হয়েছিল ভেবে পাই নে।

আমাদের সঙ্গে মেলামেশায় ভয়ের কারণটা কোথায় ঘটল ?

আপাততঃ শাদা চোখে দেখা না গেলেও—পরোক্ষে যে তোমার সঙ্গে মেলামেশায় আমার আর ভবিষ্যতে ক্ষতি হতে পারে সে তুমিও জান, আমিও জানি।

কেন ?

আবার অবুঝের মত প্রশ্ন করচ ? ভাবতাম্, তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি বেশ আছে, কিন্তু মোটে দেখচি তাও নেই। সব সময় যে টিকটিকি ফেউয়ের মত তোমার পিছনে ঘুরচে, তা কি তুমি জান না!

উৎসাহ একটি ছোট্ট হুঁ করে।

বেশ ভাই, এবারে বিদায়ের পালা। দুঃখ করো না —আবার যদি কখন জীবনে সুদিন আসে তবে নিশ্চয়ই

আমরা ঠিক আগের মতই মেলামেশা করব। সাংসারিক স্বার্থের বিবর্তনকে কি করেই বা অস্বীকার করি! অর্থকে বাদ দিয়ে জীবন নয়। জীবনকে বাঁচাতে হলে অর্থ চাই-ই। কল্পিত দারিদ্র্যে সুখ থাকতে পারে—কিন্তু সে ক'দিন?

উৎসাহ অনেকটা আহতের সুরে বলে, বন্ধু তোমার দার্শনিকতা একটু বন্ধ কর। কেন মিছেমিছি কৈফিয়তের প্রশস্তি? প্রয়োজন দেখি না!

Good. That's like a brave young fighter—বিদায়। কৌস্তুভ তোমার কাছেও বিদায় চাইচি। যাবার সময় শুধু অনুরোধ sentimentকে প্রশ্রয় দিও না।

মিথিলেশ চলে গেলে উৎসাহ ও কৌস্তুভ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তারপরে উৎসাহই পুনরায় সুরু করে, বুঝলে কৌস্তুভ আমাকে সম্প্রতি দিন কয়েকের জন্য দেশে যেতে হচ্চে। যদি ভাল লাগে গ্রীষ্মের ছুটীটাও সেখানেই কাটিয়ে আসব।

কৌস্তুভ বলে, সময়টা বোধহয় কাব্য-লক্ষ্মীর চর্চায় কাটাবে?

ঠিক তা' নয়। দেশে যেতে হবে কারণ জমিদারী-সংক্রান্ত এমন কতগুলি জরুরী কাজ পড়েচে যে না গেলেই নয়। স্যাণ্ড-উইচ্ খাবে? এই ছোকরা···

'ছোকরা' সম্ভাষণটা শ্রুতিকটু। আমার ত বেশ

মনে আছে ছেলেবেলায় আমায় যদি কেউ 'ছোকরা' বলে হাঁক দিত, তা'হলে মনে মনে এত কষ্ট পেতাম যে বলবার নয়, অনেক সময় গোপনে কেঁদেও ফেলেচি। বিলেতি রীতি 'বোয়' নন্দ নয়···

'বোয়'ও ছোকরারই নামান্তর।

তবুও তাতে বৈদেশিক ছোঁয়াচ্ থাকাতে কাণে লাগে না।

আচ্ছা কৌস্তুভ, মিথিলেশ যে কথা কয়েকটি বলে গেল, তলিয়ে দেখলে তার ভিতর যথেষ্ট সত্যতা আছে। আমার মনে হয় তুমিও যদি আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারতে তবে হয়ত তোমারও ভবিষ্যতের পথ সুগম হোত।

কি যে বল!

না, না—বল্‌চি আমি ঠিকই।

তা আর কি করে এখন সম্ভব হোতে পারে?

উপায় নিশ্চয়ই আছে। তোমায় বলতে বাধা নেই গ্রীষ্মের ছুটীর পর যে সুবিধে তুমি আমাদের এখান থেকে পাচ্ছ সেটাই যদি তুলে দেওয়া যায়, তুমি অন্য কোথায়ও বাস করবার আস্তানা ঠিক করে নিতে পার।

ছুটীর পরের কথা ছুটীর পরেই উঠবে এখন।

তা উঠুক আপত্তি নেই, কিন্তু প্রস্তাবনাটা করে রাখা গেল।

চার

উত্তর বঙ্গের একটি জেলা শহরে কৌস্তুভ আজ প্রায় মাস দুই যাবৎ এসেচে! ছুটীর প্রথমটা ভাই বোনের সঙ্গে হৈ হৈ করে ও পিতামাতার স্নেহাদরে কেটে যায় বেশ স্ফূর্তিতেই। ছুটীর মাঝের অংশটা কাটে চিঠির ভিতরে নীলার সঙ্গে নানান বিষয়ে আলোচনা করে। যেমন: বর্তমানের 'শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজ'—'বিশ্ব-সাহিত্যের ধারা—তারপর 'শিল্পের খাতিরে শিল্প', 'চলার খাতিরে চলা' ইত্যাদি মামুলি কথা নিয়ে পাতার পর পাতা প্রবন্ধ লিখে—ইংলণ্ডের ডে ল্যুইস ভাল কবি না ষ্টিফেন স্পেণ্ডর্র ভাল—ফ্রান্সে জিদের জোর বেশী, না রোলাঁর রোল বেশী—ধনিক গোষ্ঠীর মুণ্ডুপাত, শ্রেণীহীন সমাজের সুখস্বপ্ন, সমাজ-তন্ত্রের জয় গান ইত্যাদি। এরপর আলোচনা চলে একটু অন্য খাদে, স্বরগ্রামগুলি যেন ঢিলে হয়ে যায় অর্থাৎ সিরিয়াস টপিকস্ থেকে একেবারে লঘু আলোচনায় লম্ফ প্রদান—আচ্ছা মানুষের মন, মনের ডিসেক্সন করলে যে কি মেলে সে খবর শুধু মনই জানে! নীলা লিখচে: সজারু দেখেচেন? শুনেচি মফস্বলে এ জিনিষটার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। সজারুর গায়ে এত বড়

বড় কাঁটা হয় কেন? আত্মরক্ষাই যদি প্রধান কারণ তবে শেয়ালের গায়ে কাঁটা নেই কেন? সেদিন জু'তে গিয়েছিলাম—ক্যাঙারুরা আত্মগোপন এত ভালবাসে কেন? দেখে মনে হয় প্রকাশের ভীরুতা এদের সহজাত। শোনা যায় কোন কোন মানুষ ঠিক ক্যাঙ্গারুর মতই ভীরু—ইত্যাদি।

সম্প্রতি একটি দুঃসংবাদ পেয়ে কৌস্তুভের মনটা কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হয়। তবে সেটা সাময়িক, কিছু পরেই আবার চাঙা হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা এই রকম: সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কৌস্তুভ যে আবেদনপত্র পেস করেছিল তারই গোপন ফলাফল জানতে পারা গেছে। কৌস্তুভের পুলিশ রিপোর্ট অত্যন্ত খারাপ, কাজেই জেলা হাকিমের পক্ষে কৌস্তুভকে নমিনেশন দেওয়া চলে না।

দুঃখটা কৌস্তুভের চাইতে কৌস্তুভের পিতামাতারই বেশী হয়। অবশ্য তার যথেষ্ট কারণ আছে। কৌস্তুভের পিতা সামান্য বেতনে জেলা হাকিমের কোর্টে পেশকারি করেন। আর তার অনেকগুলি ভাই বোনদের নিয়ে তাদের সংসার আয়ের তুলনায় বেশ বড়। ইচ্ছে ছিল ছেলেটি একটু বড় চাকরি বাকরি পেয়ে পরিবারের দুঃখ লাঘব করবে, কিন্তু বাস্তবে আর তা ঘটে উঠল না। লেখাপড়ায় এমন ভাল

ছেলে পাওয়া ক'জন পিতামাতার ভাগ্যে ঘটে। শুধু অসাবধানতার জন্য পুত্র নিজের ভবিষ্যৎটিকে মাটী করে বসলে—এর চাইতে দুঃখের আর কি আছে!

কৌস্তুভ ভাবলে অন্য রকম। সাম্রাজ্যবাদীর জয় গান করবার দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়াই তার চরম জয়। যদি সত্যি সত্যি পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেত, তবে হয়ে উঠ্‌ত একটি পাকা স্নব্। দুঃখের ভিতর দিয়ে মানুষের যে সত্য পরিচয় পাওয়া যায়, সুখের ভিতর দিয়ে তা সম্ভব নয়। দুঃখই মানুষকে চেনবার ও বুঝবার কষ্টিপাথর।

কল্পনায় যা' সহজ ও সম্ভব, বাস্তবে তাই রুদ্ররূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। জীবনে দায়িত্ব না জন্মালে সংসারকে ঠিক বোঝা যায় না। কৌস্তুভের অলস চিন্তা অনেকটা বিলাসের মতই ছিল। যেমন কাজ না থাকলে অকাজ এসে কাঁধে ভর করে, ঠিক তেমনি ছাত্রাবস্থায় কল্পনা আছে বলেই ছাত্রেরা সময় কাটাতে পারে, নইলে সময়ের গুরুভারে পথ চলা মুস্কিল হয়ে পড়ত।

কিন্তু কল্পনায় মানুষের দিন চলে না! ইতিমধ্যে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে যায়। কৌস্তুভের পিতা প্রাতঃকালে উঠে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। সুস্থ সবল মানুষ—হঠাৎ ঝিমিয়ে পড়ে হার্ট ফেল করে মারা যান। পরে ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা যায় সন্ন্যাস রোগ। ব্যাপারটা

ঘটতে যত না সময় লাগল তার চাইতে অনেক দ্রুত একটি নির্ভরহীন পরিবারকে জীবনধারণের দুশ্চিন্তার আতঙ্কে ফেলে গেল!

কৌস্তুভ যেদিকে তাকায় সেদিকেই ব্যর্থতার ক্রুর ইঙ্গিত। অনেকগুলি ভাইবোন আর মাকে নিয়ে পরিবারের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে করে। অথচ মানুষের ইচ্ছে থাকলেই সব কিছু করা চলে না। একমাত্র রাষ্ট্রের আমূল সংশোধন ছাড়া যে প্রাণহীন সমাজে প্রাণ দেওয়া যাবে না—সেকথাও বেশ বুঝতে পারে। এখন প্রাথমিক কর্তব্য গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান, তারপর অন্য চিন্তা। কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্ব তাকেই বা বইতে হবে কেন? যে ব্যক্তি সরকারী কাজ করতে করতে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হলো তার সম্বন্ধে রাষ্ট্রের দৃষ্টি না থাকলে চলবে কেন? এ দায়িত্ব ত শুধু একা তার নয়, রাষ্ট্রেরও আছে।

এসব গেল মনের নিভৃত গবেষণা। তারপরেও আছে। কৌস্তুভের মা ও আশেপাশের শুভানুধ্যায়ীরা উপদেশ দিলেন: যা হবার তা'ত হয়ে গেল, এখন কালেক্টার সাহেবের সঙ্গে তুমি গিয়ে একবার দেখা কর গে—যদি কোন সুবিধে করতে পার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রস্তাবে সম্মত হতে হলো।

কালেকটার সাহেব বললেন, আমি তোমার পিতার মৃত্যুতে সত্যিই দুঃখিত। তোমাকে নমিনেশান দিতে আমি পারি নাই, সবই ত বোঝ, আমার হাত পা বাঁধা। তবে তোমার সামান্য উপকার করব, এই কালেক্টারিতে তোমার একটি চাকরি দেবো, তা' তোমার বিরুদ্ধে যত' খারাপ রিপোর্টই থাকুক না কেন।

কৌস্তভ ধন্যবাদ দিয়ে বের হয়ে আসে।

তার পর দিনই চাকরী হয়ে যায়।

চাকরীতে ঢুকে মনে হল এক নোতুন জগতে প্রবেশ করেচে। এ জগতের প্রাণীরা এক একটি স্বতন্ত্র জীব, এদের চক্ষু লজ্জা বলে কোন বস্তু নেই। যখন যা' ইচ্ছে যাকে তাকে বলে, মেজাজ ও ক্ষমতা দেখাবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত, সামান্য কাজ বা খপর বলে দিয়ে লোকের কাছে উপরি পাওনার লালসা, আত্মসম্মানজ্ঞান রহিত এক অদ্ভুত সম্প্রদায় বিশেষ। এ জগতের লোকের সঙ্গে তার পরিচয় নেই, সে অপরিচিত আগন্তুক।

প্রথমদিন কাজে বসে কৌস্তভের উপর ভার পড়ল বয়নামা নকল করবার। সে নির্বিবাদে নকল করে যায়, কাজ শেষ হয়ে গেলে পার্টি কপি নিতে এসে তার হাতে একটি টাকা দেয়। বিস্ময়ে কৌস্তভ বলে, এ কিসের টাকা? তখন পাশের ভদ্রলোক বলেন, হায় হায়

একেবারে আন্‌কোড়া। আরে সাধা লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলতে নেই—না নিলে চলবেই বা তোমার কি করে—এই ত সামান্য মাইনে। কৌস্তুভ বলে, আমার কাজের জন্য আমি ত মাসে মাসে মাইনে পাব। ভদ্রলোকটি বলেন, তুমি নোতুন লোক, অনেক কিছু বোঝ না—এ হচ্ছে জীবনের প্র্যাক্‌টিকাল পরীক্ষা, এতদিন যা' কিছু করে এলে সব থিওরেটিকাল্। আর যাই কর বাবা, তুমি ফিল্ডটিকে নষ্ট করো না।

কৌস্তুভ নিঃশব্দে টাকাটি নিয়ে ভদ্রলোকটির হাতে দিলে। ভদ্রলোকটি তখন অপর একজনকে দেখিয়ে একটু বিকৃত হেসে বললেন, দেখ হে ছোক্‌রার টাকায় অরুচি। যখন নেবেই না, তখন দেও—মা লক্ষ্মীকে ত আর পায়ে ঠেলতে পারি নে। অধর্ম কাজ কোনদিন করিনি।

অফিসের হাবভাব ও নিয়ম কানুন দেখে কৌস্তুভের মনে হয় সে যেন এরই মধ্যে অনেকখানি বুড়িয়ে গেচে। পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ কি করে যে পঁচিশ বছরের ছোক্‌রার সঙ্গে যৌবনোচিত রসিকতায় মশগুল হয়ে উঠতে পারে একথা নিজে চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারত না। এদের কোন মাত্রা জ্ঞান নেই। এই পঙ্কিল আবহাওয়ার মধ্যে মনের ও দেহের মোটেই সুখ পায় না।

কবে যে এই বিশ্রী আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেতে পারবে সেই চিন্তাতেই অবসর সময় কাটিয়ে দেয়।

সেদিন অফিসে পৌঁছতে কিছুটা দেরী হয়ে গিয়েছিল। অফিস সুপার একটু মিটেকড়া সুরে শুনিয়ে দিলেন, ওহে ছোক্‌রা অফিসে ঠিক সময় আসতে হয়, জেলের কয়েদীর মত অফিসের হাজিরা লেখা বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর ও লজ্জাকর, সেকথা যারই একটু মান সম্মান জ্ঞান আছে তিনিই বুঝবেন। সত্যি, কেরাণী জাতটাকে যে কি ভাবে অবিশ্বাস করা হয় তা' এই সামান্য ব্যাপার থেকেই বেশ বুঝতে পারা যায়,—অথচ এই কেরাণীবাবুদের দিয়ে কলুর বলদের মত কত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সরকার করিয়ে নেন তা' এই বলদেরা মোটেই বুঝতে পারে না। আমলাতন্ত্র ব্যবস্থার স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচার বোধকরি এভাবেই তার বনিয়াদ্ পাকা করে নেয়।

আর একটা কথা কৌস্তভ এখনও বুঝতে পারে না—এই যে অফিসার নামধেয় ডেপুটী ও সাব ডেপুটী জাতটাকে। এদের অর্থহীন কতগুলি মামুলি সহির কি যে মূল্য, তা' ঠিক বোঝা যায় না, কারণ কাজে কোন কিছুর ভুল ভ্রান্তি থাকলে উপরের অফিস থেকে যখন কৈফিয়ৎ তলব করে, তখন সদাশয় অফিসার মহাশয় নিঃসংকোচে কেরাণী বাবাজীবনকেই দায়ী করেন, এবং

সেই অনুসারে জেলা হাকিমকে জানাতে কসুর করেন না। ফাইলের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে নির্বোধ কেরাণী বাবুরা যখন ভেকু ভেকু মুখ নিয়ে হাকিমের এজলাসের নিকট 'সহি' রূপ কৃপার জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন তা' দেখে কার না কষ্ট হয়; কিন্তু হাকিম সাহেব সেই সময় তার ভাই হাকিমদের নিয়ে খোস গল্প ও ধূম্রপানে ব্যস্ত। তাঁদের বিশাল ও উদার দৃষ্টি সহজে কেরাণী বাবুকে লক্ষ্যের মধ্যে ফেলতে বোধ হয় পদমর্য্যাদায় ঘা' দেয়। সে জন্যই বিশেষ করে তাঁরা তখন আলোচনার বিষয়টাকে আরও গুরুত্ব আরোপ করেন, উপেক্ষিত কেরাণী চাতক পক্ষীর মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

হাকিমরা সকলে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। একে অন্যের দাদা ভাই সম্পর্ক। কৌস্তুভকেও এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সে কাণ-পেতে হাকিমদের নিরলস রসালাপে মনোযোগ দেয়; কিন্তু ভেবে পায় না এমন ধরণের আলাপও কোন সুস্থ মানুষ করতে পারে, তাঁদের আলোচিত বিষয় বস্তু এমন কিছু উচ্চাংগের নয়—অত্যন্ত সাধারণ, থার্ড ক্লাশ বাজে। ক্লাস্ খেলায় কবে কে কত হেরেচে ও জিতেচে তারই ফিরিস্তি, অমুকের মেয়ের কার সঙ্গে ভাব, ওই প্রবেশনারী ডিপ্‌টি কেন এস, ডি, ও'র বাড়ী এত ঘন ঘন খানার নেমন্তন্ন পায় ইত্যাদি।

এসব শুনে কৌস্তভের ইচ্ছে করে, ধরণী দ্বিধা হও আমি তোমার ভিতরে প্রবেশ করি। কবে যে এই বন্দীশালা হতে মুক্তি পাবে তা' কে জানে। একটি হিন্দু যুবকের ও একটি খৃষ্টান যুবকের মাতাপিতার প্রতি দায়িত্বের ব্যবধান আকাশমাটী। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও আমাদের আবার intutionএর culture—বুদ্ধি দিয়ে একে ধরা ছোঁওয়া যায় না। Spritual Soul of Indiaর সন্ধান নিতে আধিভৌতিক তত্ত্বের আশ্রয় নিতে হবে। কি করে যে এমন সুন্দর দেশে এরূপ অদ্ভুত নিয়মের সৃষ্টি হলো বোঝা শক্ত!

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য সম্ভারে যে দেশের তুলনা হয় না, ভৌতিক ও আধিভৌতিক ক্রিয়াকলাপ যে দেশে এই বিংশ শতাব্দীতেও চালু আছে—তেত্রিশকোটী দেবতার মূর্তি রচনা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশ কল্পনায় আনতে পেরেছে কি না সন্দেহ—এমন যে দেশ, সে দেশের সমাজ ব্যবস্থা একটু বিচিত্র হবে তা'তে আর বিস্ময়ের কি আছে! দুঃখ হয় এই ভেবে যে এদের নিজেদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের সম্বন্ধে দূরদৃষ্টি নেই। সংসার করতে হবে কাজেই একটা সংসার পাতিয়ে বসলে—এর মধ্যে আর ভাবনা চিন্তার স্থান নেই—একেবারে খোলা বইয়ের পাতার মত সহজ, সরল ও স্বচ্ছ।

দারিদ্র্য যে দেশের অস্থিমজ্জায় তার কি এই অবিবেচকের মত কাজ শোভা পায়! জমির সীমা ইলাসটিক্ না হলেও মানব জন্মের সীমা যে ঠিক ইলাসটিক্ রাবারের মত, সে কথা আর এই বিজ্ঞানের যুগে অস্বীকার করবার কি উপায় আছে! সে জ্ঞান এই ধর্মভীরুদের ধর্মের একটি অংগ করে না তুললে বোধ করি এরা সহজে মেনে নেবে না। ধর্মের নামে অনেক কুকাজ এদেশের লোক ক'রে---তার নজির স্বরূপ ইতিহাস আজও সাক্ষ্য দেয়।

অর্থের মানদণ্ড ব্যতীত আজকালকার সভ্যতা গড়ে ওঠা উচিত intellectual equalityর উপর। কৌস্তুভ বলে, এর মানে এই নয় যে সে আজ আশানুচিত পদ পায়নি বলে মনের বিক্ষোভ থেকে এরূপ মনোভাবের জন্ম। যদি বুদ্ধিজীবিদের কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকে, তবে তাদের মতের পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু মফঃস্বলের হোমরা চোমড়াদের শ্রেণীজ্ঞান বড় টন্ টনে—ঠিক এদেরই যদি বুদ্ধিজীবি বলে আখ্যা দেই তবে মস্ত ভুল করা হবে। শুভ বুদ্ধির নামে সর্বদা এঁরা বিকৃত বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত--এদের কাছে সমাজের কোন শুভাশুভ আশা করা স্রেফ্ বাতুলতা।

মনে হয়, কলেজ জীবনের সেই আশা আর আনন্দে ভরা নিরবিচ্ছিন্ন সুখের দিনগুলি, নিছক বাস্তবতার

কাঠিন্য, ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ নিয়ে হানাহানি আর এই শ্রেণী-বিরোধে—কত পার্থক্য।

অফিস আর বাড়ী এইভাবে তার দিন কাটে। কারও সঙ্গে একটা মেলামেশা করে উঠ্‌তে পারে না। কেউ কেউ ভাবে, ছোঁড়াটা বড় দাম্ভিক, দেমাকে ফেটে পড়ে, তোর মত বিদ্যের লোক যেন আর অফিসে নেই! কেন ওই কেষ্ট বাবুও ত এম, এ পাশ—কেমন হাসিখুসি সবার সঙ্গে কথা বলেন প্রাণ খুলে—দেখতেও ভাল, শুনতেও ভাল—আর ছোঁড়া তুই ত এম, এ পড়ছিলি তাও পাশ দিস্‌নি—তাইতেই এত! এসব কথা কৌস্তুভ শুনেও শোনে না। তার ইচ্ছে ভাই বোনেরা সাবালক হয়ে একটু উপায়ের পথ ধরতে পারলেই সে চলে যাবে বহুদূরে—কল্পনায় যাকে ধরা ছোঁয়া যায়—অথচ নাম জানে না, শুধু মনে মনে অনুভব করাই চলে।

নীলাও উৎসাহকে পূর্বেই সে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা জানিয়ে চিঠি দিয়েচে। উৎসাহ লিখেছিল, তুমি এসে পরীক্ষা দিয়ে যাও—তোমার কোন ভাবনা নেই—তোমার যা' অভাব-অভিযোগ তা' এখন বন্ধুর হাতে তুলে দেও—সংকোচ করো না। কৌস্তুভ উৎসাহের উদারতা সম্বন্ধে মনে মনে প্রশংসা করলেও সাহায্য নিতে পারে নি।

উৎসাহের কাছ থেকে হয়ত সাহায্য নিলেও নিতে পারত, কিন্তু নীলা—তার চোখে নিজকে খাটো করে ধরতে কেমন কুণ্ঠাবোধ হয়।

আশা আর কল্পনায় ভর করেই মানুষ পথ চলে। কৌস্তুভও তেমনি পথ চলেচে। জানে না এ-আশার সিকি অংশও কোনদিন সার্থক হবে কিনা। পথ চলতে হয় পথ চলে, পথিক জানে না কোথায় যাবে, কি পাবে, কি হবে —ঠিক তেমনি সেও পথ চলেচে। দিন কাটাচ্ছে—জানে না কি হবে, কি পাবে। অতীন্দ্রিয়, শাশ্বত, রূপ, অরূপ, আত্মা ইত্যাদি বড় বড় কথা দিয়ে জীবনকে যাচাই করতে চায় না—সে বুঝতে চায় বাস্তব মানুষ আর তার মনকে। বিংশ শতাব্দীর বড় কথা মানুষ—মানুষকে বাদ দিয়ে মানুষকে বিচার করতে গেলে আসল জিনিষই বাদ পড়ে। সেখানেই গোল বাধে—বর্তমানের সঙ্গে অতীতের।

পাঁচ

উৎসাহদের পরিবারে অনেক অদলবদল হয়ে গেছে। ঠাকুরমা মারা গেচেন, মা গিয়ে কাশীতে বসবাস করচেন। নীলা বেথুন কলেজে লেকচারার। উৎসাহের অবিনাশ বাবুর মেয়ে শ্রীলতাকে পাণিগ্রহণ।

বিবাহের পরে উৎসাহ শ্রীলতাকে নিয়ে দেশে গিয়ে থাকাই স্থির করে। জাতির মেরুদণ্ড পল্লীগ্রামে। শহরে বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসে, সেটি সোফায় পরিবেষ্টিত হয়ে, হয়ে, খস্‌খসের পর্দ্দার শীতল আবহাওয়া উপভোগ করে, গণ-আন্দোলনের জয়গান করা চলে না। গণ-আন্দোলনের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক বা যাঁরা গণ সাহিত্য সৃষ্টি করতে চান তাঁদের চাষা-ভূষা, মুটে মজুরের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সবিশেষ জানতে হলে, তাদের ধরণে জীবনযাপন করাও যে একান্ত প্রয়োজনীয় সেকথাও উৎসাহ বেশ বুঝতে পারে। যাঁদের জীবন সম্বন্ধে জানি না তাঁদের নিয়ে আন্দোলন করা যে কত বড় ভুল সেকথা বুঝতে পেরে উৎসাহ মনে মনে পীড়া পায়। কৃষকপার্টির লিডারকে কৃষকই হতে হবে, শ্রমিকের মুখপাত্র হবে শ্রমিক, ট্রেড্‌ য়ুনিয়নের সভাপতি হবে এদেরই প্রতিনিধি। কাজেই

জাতিকে বলিষ্ঠ করতে হলে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন

শ্রীলতা কিন্তু বিয়ের পর পল্লীগ্রামে যেতে প্রবল আপত্তি প্রকাশ করেছিল। উৎসাহ কোনক্রমেই রাজি হয়নি! তারপর শ্রীলতার শেষ অনুরোধ—অন্ততঃ একটি মাস কলকাতায় থাক। অবশ্য এ আবেদন মঞ্জুর হয়। একমাস ফুরিয়ে গেলে শ্রীলতা নীলার নজির দেখায়। বলে ঃ ঠাকুরঝি তোমার আপন মায়ের পেটের বোন তার জন্যেও কি তোমার মায়া দয়া নেই। সে থাকবে এখানে একলা আর তুমি থাকবে আরেক জায়গায়। ব্যাপারটা বাইরে থেকে দেখতেও ত ভাল দেখায় না। শেষ পর্যন্ত আর কোন ওজর আপত্তিই টেকে নি।

গ্রাম সম্বন্ধে শ্রীলতার যে বিভীষিকা ছিল, আসলে জমিদার বাড়ীতে তার পার্থক্য দেখতে পেয়ে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু জমিদার বাড়ীতে পুরাতন নিয়ম কানুনগুলি মেনে চলতে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। কর্তার আমলের দাসীকে সম্মান জানিয়ে কথা বলতে হয়। যখন তখন বাড়ীর বাইরে বেরুবার নিয়ম নেই। শোনা যায় পূর্বে বাড়ীর মেয়েদের বাইরে বের হওয়া একেবারেই নিষেধ ছিল—এখন তাও উৎসাহের আমলে সকালে বিকেলে বাইরে বেড়ান চলে।

উৎসাহ তার জীবনযাত্রার একটা কর্মতালিকা তৈরী করে ফেলে। সকালে ঘুম থেকে উঠে মাঠে চলে যায়। কৃষকদের আধুনিক বিজ্ঞান সম্মতভাবে চাষবাসের কথা বলে উৎসাহিত করে। শীগ্‌গিরই গ্রামের কৃষকদের জন্য একটা মোটর লাঙ্গল কিনে দেবে। জমিতে সার দিয়ে কি করে জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা চলে সেবিষয়ে অনেক বই ঘেঁটে রাত্রিতে বসে প্রবন্ধ তৈরী করে। সকালে সোজা বাংলায় কৃষকদের বুঝিয়ে দেয়। গ্রামের লোকের সুবিধের জন্য ইতিমধ্যেই কয়েকটি নলকূপ বসিয়ে দিয়েচে। উৎসাহ প্রমাণ করতে চায় এই কথা যে জমিদারদের শুধু জমির খাজনা আদায় করাই কাজ নয়। জনহিতকর ও গ্রামের উন্নতিমূলক কাজও জমিদারের দায়িত্বের একটি অঙ্গ স্বরূপ।

সন্ধ্যা বেলা, নাইট-স্কুল।

শ্রীলতার উপর ভার গ্রামের মেয়েদের পড়াবার আর ছেলেদের পড়ায় উৎসাহ নিজে। ছোট লোকের মেয়েদের পড়াতে শ্রীলতার গা ঘিন্ ঘিন্ করে; কিন্তু স্বামীর উদ্ভট খেয়াল তাই উপায়হীন। উপরন্তু সে ঘণ্টা দুই পড়িয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একমাস হোলো পড়াচ্চে তবু তাদের অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় করাতে পারলে না। শ্রীলতা সেদিন স্পষ্টই বলে দিয়েচে: এ কাজ আর তাকে দিয়ে

চলবে না। মেয়েগুলোর মাথা গোবর দিয়ে ভরা—এক একটা আস্ত ইডিয়ট্‌। বললে বোঝে না, কথা বললে শোনে না!

উৎসাহ ব্যথিতদের জন্য কণ্ঠে দরদ দিয়ে বলে: আমাদের এত সহজে ধৈর্য হারালে চলবে না। আমাদের কাজের পরীক্ষা হবে ধৈর্যের কষ্টিপাথরে!

শ্রীলতা ঝাঁজাল স্বরে জবাব দেয়: তোমাদের মত জমিদারশ্রেণীর লোক দেখলে আমার করুণা হয়। কাজ না থাকলেই অকাজ এসে ভিড় করে। মাথাটা হয়ে ওঠে শয়তানের এক একটা কারখানা। পুরুষ মানুষ তার নাকি সময়ের জ্ঞান নেই। বাবাকেও ত কাজ করতে দেখেছি।

উৎসাহ নির্লিপ্তভাবে বলে, তোমার বাবার মত সবাই আর আই, ই, এস নয়।

শ্রীলতা সংকোচের পর্দা সরিয়ে দিয়ে বলে, নয় বলেই এই দুর্দশা। সব মানুষেরই জীবনে একটা লক্ষ্য থাকে। লাইফের ফাণ্ডামেন্টাল কাজ বলে কতগুলি কাজ থাকে; কিন্তু তোমার কি আছে শুনি। নিরন্নের ভাত জোটান, অসহায়ের মুখে ভাষা দেওয়া যে কতখানি বাতুলতা তা' আর কা'কে বোঝাব। মানুষের সবার আগে ভাল খাওয়া, ভাল থাকা, ভাল পড়া—তারপর সময় হলে অন্য কাজ।

তুমি এতবড় বিরাট দেশকে একা কি করতে পার? তোমার ক্ষমতা কতটুকু?

উৎসাহ উদাস ভাবে বলে, অন্তত দেশের পাঁচটি লোককেও যদি আমি আমার মনোমত শিক্ষা দিয়ে যেতে পারি, তবেই ভাবব আমার সাধনা সার্থক হয়েচে।

শ্রীলতা শ্লেষ দিয়ে বলে, ওসব কথা কবিতায় শোনায় ভাল। তুমি আসলে একটি কথার জাহাজ। Practical field সম্বন্ধে তোমার কোন আইডিয়া নেই।

উৎসাহ আশাহীনের মত জবাব দেয়, কি বলব শ্রীলতা তুমি আমার স্ত্রী, নইলে—

শ্রীলতা চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে করতে বলে, নইলে, নইলে কি করতে—অপমান করতে, না? অপমানের আর বাকী রেখেচ কি? যার এত দেশপ্রেম তার আর নারীর প্রেমে প্রয়োজন কি! তোমাদের মত পুরুষের বিয়ে না করাই উচিত। অপরের মনের প্রতি জুলুম চালাতে লজ্জা হয় না।

উৎসাহ মিনতিপূর্ণ স্বরে বলে, শ্রীলতা মনটা তোমার বড্ড বেশী আজ উত্তেজিত হয়ে পড়েচে। এখন আর কথা নয়।

কণ্ঠে রুক্ষতা বজায় রেখে শ্রীলতা বলে, উত্তেজনার সময়ই সত্যি কথা বলা চলে। নইলে তুমি ত আমাকে-

একটি জরদ্গব বানিয়ে রেখেচ। চিরকাল আমি শহরে মানুষ আর আমাকে এনে কি করলে—না এ নির্জন পল্লীগ্রামের কতগুলি মূর্খ ইতর লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার ব্যক্তিগত শান্তিটুকু পর্যন্ত হরণ করলে···

উৎসাহ দুঃখের সঙ্গেই বলে, কি করব শ্রীলতা, তুমি আমাকে পেয়ে সুখী হতে পারলে না···

শ্রীলতা সহজ গলায় সুরটা মোলায়েম করে বলে, যার টাকা আছে তার সুখী অসুখী হওয়া ত নিজের হাতে। টাকা থাকলে আজকের দিনে বুদ্ধি, মান, সম্মান, জ্ঞান কি না থাকে! এরই সুব্যবস্থা করে চললে, জীবন সহজ হয়ে আসে। তুমি এবং আমিও সুখী হতে পারি অর্থের সুবণ্টন করে। তা' না তুমি প্রজাদের খাজনা মাফ করবে, তাদের সঙ্গে গলায় গলায় মিশবে, নিজের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে হারাবে, সত্তাকে বিসর্জন দেবে, শরীরকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেবে—এ দেখলে কার না কষ্ট হয়···

উৎসাহ এবার শ্রীলতার অভিমানের সুরটুকু ধরতে পেরে বলে, শ্রীলতা তুমি ত অবুঝ নও। এদের মত দুঃখী আর পৃথিবীতে কে আছে! এরা যে অত্যন্ত অসহায়···ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ বোধ এদের নেই বললেই

চলে…অভাব বলে যে একটা জিনিষ পৃথিবীতে আছে, তা এদের দেখে মনে হয় না…এদের সরলতা লক্ষ্য করেচ কি তুমি? এদের ভিতরে অভাববোধটি যদি একবার জাগিয়ে তুলতে পারি তবেই দেখবে এরা এদের দাবী জানাতে কখনও কসুর করবে না…

শ্রীলতা নিরালম্বভাবে জবাব দেয়, এদেশে আরও লোক আছে, না একা সব ভারই তোমাকে বইতে হবে। দেশোদ্ধার কি তুমি একাই চাও না আরও লোক চায়। আর এসব•কাজ State নিজে হাতে না নিলে তোমার আমার কাজ নয়—তুমি ত economiecsএরও ছাত্র ছিলে।…কাজই মানুষের সব নয়…কাজ হচ্ছে বাঁচবার পক্ষে একটা means, তাই বলে end নয়…তুমি তোমার পারিবারিক দায়িত্বকে উপেক্ষা করে বিশ্ব দায়িত্বকে মাথায় তুলে নিতে যাচ্ছ…তাই না এই অসামঞ্জস্য…ঘরকে চিনলে না, চিনবে বিশ্বকে…

উৎসাহ আবেগের সঙ্গে বলে, এসব প্রশ্নের শেষ নেই শ্রীলতা…বিংশ শতাব্দী যে কি ইঙ্গিতে শত শত যুবককে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে তা' আমার জানা নেই…তবে দেখি কি উন্মাদনা, কি আবেগ, কি আকুল আগ্রহ…ব্যক্তিগত দুঃখকে গ্রাহ্য না করে হাসি মুখে বরণ করে নেয়…চল শ্রীলতা, চল—আর এসব কথা এখন নয়, নদীর ধারে

বেড়াতে যাই···আজ দেখব আকাশের বোবা চাঁদকে, দিগন্তের তারাগুলোকে, নদীর রূপালী জলকে, উপভোগ করব দখিনা পবন···সবার উপরে তুমি থাকবে আমার পাশে···আজ আমি সুখী, আমি পরিপূর্ণ, অন্তত আজকের দিনটির জন্য···চল আর দেরী নয়···

খুসীতে উচ্ছল হয়ে শ্রীলতা এলিয়ে পড়ে, ভাবে : বক্তৃতার কাজ হয়েচে। লোকটির অন্য কোন গুণ না থাকুক, বোঝালে বোঝে। নারী মনের শান্তি মেলে। নারী চায় নিজের আবেষ্টনীর মধ্যে পরিতৃপ্ত থাকতে। নিজেকে ছাড়িয়ে বাইরে যে গণ্ডী সেখানে নিজেও যেতে চায় না, প্রিয়জনকেও নয়···

উৎসাহ ভাবে : পৃথিবীর দুঃখ-দৈন্য, অভাব অভিযোগ, অন্যায় অত্যাচার, পীড়িতের আর্তনাদ—এর সঙ্গে একটি সুস্থ মানুষের সম্বন্ধ কতটুকু! জীবনে সুখ কোথায়, অনন্ত শান্তি কি কোথাও আছে!

চাকরী—চাকরীই কি জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিষ, শ্রীলতা ভাবে : তার বাবা প্রফেসার—কেমন সুন্দর, দেখতেও শোভন···শুনতেও ভাল···কিন্তু প্রফেসারি একঘেঁয়েমির চূড়ান্ত, নিত্যি একই জিনিষ পড়িয়ে ছাত্রদের মেজাজ বুঝে হাসি কান্না ও গাম্ভীর্যের অভিনয় করতে হবে—এর মত tedious আর কি আছে···মনে হয়, চাকরী করলে

শ্রীলতা সুখী হয়, কিন্তু আমাদের বংশে ত কেউ চাকরী করেনি—শুধু চাকর রেখেচি। চাকরী করা বংশ মর্যাদার দিক থেকেও ত আমাদের অপমান···সেটুকু বুঝবার ক্ষমতাও কি শ্রীলতার নেই···চাকরী না করলেও আমার বর্তমান মাসিক আয় একটি ঝানু সিভিলিয়নের তিনগুণ। অথচ জমিদার হিসেবে আমরা গরীব।

নীলা—নীলার চাকরী ত সখ করে। সময় কাটাবার একটা কৌশল মাত্র। বিয়ে করলে না—মেয়েমানুষ চাকরী ছাড়া আর কি-ই বা অবলম্বন আছে···বিয়ে করলে না—সেজন্য দুঃখ নেই—কারণ মানুষের জীবনে বিয়েই একমাত্র কাম্য নয়···জীবনের সৌরভ বিকশিত করবার জন্য যে আত্মসংযম, প্রতীক্ষা ও ধৈর্যের প্রয়োজন তা' নীলার আছে···কিন্তু তাই দিয়ে কি সে তার পরমার্থকে পাবে···আমিই কি পেয়েচি···মানুষের জীবনে পরিপূর্ণতা যে কিসে আসে তা' বলা বড় শক্ত···অপূর্ণ জীবনকে পূর্ণ করবার জন্য মানুষের দিবারাত্র ব্যর্থ প্রয়াস। যুগের পর যুগ মানুষ চলেচে গতানুগতিক পন্থায়। যুগসন্ধির গোধূলির আলোয় মানুষের মনে ক্ষণিক রোমাঞ্চের দোলা দেয়—কিন্তু তার আয়ু এত কম যে এক ফুৎকারেই তার শেষ। কোথায় মিলবে সামঞ্জস্য ? জীবনের ঘাটে ঘাটে যে বিশৃঙ্খলা তার সমাধান করবে কে ?

শ্রীলতা বুকের উচ্ছৃঙ্খল আঁচলটা টেনে দিয়ে ঘন হয়ে বসে উৎসাহকে বল্লে, কি ভাবচ, বল না···

—কই কিছু না ত···

—বা এমনি সুন্দর রাত, এমনি মিঠে বাতাস, এমনি চাঁদের আলো—তোমার কি ভাল লাগচে না···

—কেন লাগবে না···

—তবে যে বড় চুপ করে রইলে···

—কি বলব বল ?

—বাঃ রে আমি বলে দেবো, তবে তুমি বলবে, কি যে কথা বল তুমি ?

—কি জানি কেন কথা বলতে ইচ্ছে কচ্ছে না···এই গভীর পরিবেশের ভিতর হাল্‌কা কথা বলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাধুর্যকে ব্যাহত করলে কি ভাল দেখাবে ?

—সত্যি কথা বল, তোমার মনে যেন কোথায় কি গরমিল হয়েচে ? আমাকে লুকোতে চেয়ো না···

—কি যে ভাবি আর কি যে না ভাবি সেকথা কি তুমি বুঝবে শ্রীলতা ? সেকথা ত বোঝান চলে না। সে ব্যথার ত রূপ নেই, কি করে বোঝাই তোমায়···

—চল আমরা এখান থেকে চলে যাই। তোমার ব্যথা এখানে থাকলে আর কিছুতেই সারবে না···যা'র যা' কাজ, ভদ্রলোকের কি আর ছোটলোকের কাজ পোষায়,

তোমার বাপ-ঠাকুর্দা কি কোন জন্মে এসব কাজ করেচেন যে তোমার ভাল লাগবে…

—শ্রীলতা পার্থক্যটা শুধু এইখানেই। আমাদের বাপ ঠাকুর্দার যেসব জিনিষ কল্পনায় আনতেও কষ্ট হোতো, আমরা সেসব জিনিষই বাস্তবে রূপ দিতে যাচ্ছি…কিছু কিছু দিয়েও ফেলেচি…গর্ব করিনে কিন্তু আমাদের চিন্তাধারার নাগাল তারা কোনদিন পাবেন না…

—রাগ করো না লক্ষ্মীটি কথা যখন উঠলই তখন বলি ঃ তোমাদের এই উন্নত চিন্তাধারার কি ফল লাভ করলে ?

—তোমরা বড্ড বেশী বস্তুতান্ত্রিক। তোমাদের চিন্তার গভীরতা নেই। সব জিনিষেরই লাভ লোকসান হাতে হাতে পেতে চাও। তোমার কি একবারও মনে হোলো না যে আমরা পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেচি…

—কি করে বুঝবো বল ? পূর্ণকে আমি বড় বেশী ভয় করি। তোমাদের বিজ্ঞান পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে জটিলতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের অতীতের অনাড়ম্বর জীবনে জটিলতাকে আমন্ত্রণ করে কি সুবিধে হবে—একবার ভেবে দেখেচ কি ?

—পূর্ণতার ভিতর জটিলতা এলেও তাকে মেনে নিয়ে

মনে তৃপ্তি পাওয়া যায়—সে জটিলতায় রোমাঞ্চ আছে—বুদ্ধির শাণিত দীপ্তির ঝলক আছে—তা'তে আছে অপরিমেয় সুখ···

—ওসব কথা বক্তৃতায় থাকলে বক্তৃতা জোরালো হয়, মানি। কিন্তু সোজা কথা গাঁয়ের অন্য জিনিষ ভাল না লাগলেও ডাক্তারদের আমার মন্দ লাগে না···বিজ্ঞানের জটিলতা বৃদ্ধি করে কথায় কথায় ওঁরা সামান্য ম্যালেরিয়া জ্বরে Blood examine করান না—ঠুকে দেন কুইনিন ইনজেক্‌শন—রোগও ছুটে পালায়—আমাদের মনও সতেজ হবে যদি আমরা মনের ডিসেক্সন্ না করে ready conclusionএর ভিতর প্রবেশ করি—নিরলস চিন্তার জাল বুনে জীবনের সারল্যকে কণ্ঠরোধ করে লাভ কি ?

—তুমি ভুল করলে শ্রীলতা, আমাদের চিন্তা নিরলস বা নিরর্থক নয়—আমরা মানবতাকে যাচাই করে নিতে চাই—মানবতা যা'তে বুর্জোয়া শ্রেণীর ভ্রূকুটিতে আর লাঞ্ছিত বা বিপর্যস্ত না হয়, তাই আমাদের ধ্যান ও ধারণা···

—আর নয় আমাকে তুমি রক্ষে কর···এসব আলোচনা এখন আর আমি সইতে পারচিনে—আমার বুকের ভিতর কেমন করচে···

উৎসাহ শ্রীলতার মাথাটি কোলে তুলে নেয়।

কিছুক্ষণ পর শ্রীলতা অনেকটা প্রকৃতস্থ হয়ে বলে, চল আমরা কোথায়ও চেঞ্জে যাই। আমার আর এই পরিবেষ্টনী ভাল লাগচে না···

—তাই চলো···কোথায় যাবে বলো ?

—দার্জিলিংএ চল···ঠাকুরঝিরও গ্রীষ্মে কলেজ ছুটী। সবাই একসঙ্গে কিছুদিন থাকি।

—বেশ তাই ভালো। তোমার ইচ্ছেতে বাধা দেবো না।

শ্রীলতা মুখটি উৎসাহের কোলের ভিতর গুঁজে লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলে, আমার শরীরও ত বিশেষ ভাল নয়। দিন দিনই আরও খারাপ হয়ে পড়বে। তোমাকে এখন বাইরে বাইরে থাকলে চলবে না। যে ভাবী বংশধরের শুভাগমন হচ্ছে তার খাতিরে তোমাকে অনেক কিছু জলাঞ্জলি দিতে হবে।

—শ্রীলতা ভাবতে আমার ভারী ভাল লাগচে। আমাদের ভিতরে যেসব শক্তির বিকাশ কোনদিনই ঘটবার সম্ভাবনা নেই তারই রূপ দেখব এই ভাবী শিশুর মধ্যে। আমরা মরেও বেঁচে থাকব এরই ভিতর দিয়ে। এই ত সৃষ্টির নিয়ম।

শ্রীলতা আরও নিবিড় হয়ে উৎসাহের দেহের সাথে মিশে যায়। অসহ্য আনন্দ, অপূর্ব পুলক, মাতৃত্বের

সূচনায় অনমুভূত রসস্বাদ। মাতৃত্ব একটি অতি পুরাতন সত্য—সেই সত্য নিজের জীবনে উপলব্ধি বোধে বিশ্বের সব কিছু নোতুন আলোকে প্রতিভাত হয়, জীবনে নোতুন রসের সঞ্চার, অপূর্ব মাদকতা। এমনি করে যুগ যুগ ধরে ঘটেচে মানুষের জন্ম, মৃত্যু, প্রেম ও আনন্দ—তবু মানুষের বিস্ময়ের শেষ নেই।

ছয়

কৌস্তুভ জীবনটাকে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারে না। সময় সময় মনে হয় অর্থহীন। মানুষ নির্দ্দিষ্ট সীমাগণ্ডীর মধ্যে থেকে এক একটা সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করচে অথচ অভিযোগ নেই। অভাববোধ না থাকলে কোন জাতি বড় হতে পারে না। যে জাতির অভাববোধ নেই, সে জাতির মত পঙ্গু জাত আর দুনিয়ায় নেই। নিজেদের অভাব উপলব্ধি করবার যার ক্ষমতা নেই, সে তাব দাবী রাষ্ট্রের কাছে পেশ করবে কি করে?

আচ্ছা, একটি মানুষের জীবনে আমরা কি পাই? একটি মানুষের জন্ম হোলো। শৈশবে অবস্থা ও মেধা অনুযায়ী লেখাপড়া শিখলে, কেউ পেলে মস্ত বড় চাকরী, কেউ বা পেলে ছোট, কেউ ফাঁদলে ব্যবসা, কেউ বা অন্য কোন উপায়ে আয়ের পথ করে নিলে। তারপর কি? তারপর সংসারের মায়া দৃঢ় করবার জন্য তার স্ত্রী হলো— আরও হলো কতগুলি পুত্রকন্যা। বন্ধন সুদৃঢ় হলো। চমৎকার সামাজিক ব্যবস্থা। প্রকৃতি গোপনে অনেক কাজ হাসিল করে নিলে। মানুষের এ ফাঁদ থেকে আর বেরুবার উপায় নেই। বার্ধক্য এলো, মানুষ বিষয়ী হয়ে

উঠলো। ঘোর সংসারী, তার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বৈষয়িক প্যাঁচ। অবশেষে একদিন মৃত্যু। সব খেলা শেষ হয়ে গেল। এই ত মানুষ।

কৌস্তুভ ভাবেঃ না বড্ড বেশি সিনিক্ হয়ে পড়ছি। এরই ভিতর সামঞ্জস্য খুঁজে নিতে হবে, ঠিক যেমনি করে চলে পৃথিবীর আর দশটি লোক। কিন্তু কোথায় তাদের সঙ্গে ত মনের মিল নেই। তারা ত তাদের নিজের অবস্থায় সুখী। তবে আমার ভিতরে এত অসন্তোষের স্তূপ কেন? যে লোক সমাজের কোন কিছুর ভিতর মাথা গলায় না, সে থাকে দশজনের নিন্দাস্তুতির বাইরে। সামাজিক দায়িত্ব-বোধের যে ভীরুতা, তাই প্রকাশ পায় তার নিঃসঙ্গতায়। সংসারের দশজনের সঙ্গে মিলে মিশে না চলতে পারলে জীবনে তৃপ্তি নেই, কারণ কথায় আছে মানুষ সামাজিক জীব।

এক একটি দিন আসে ও যায়; কিন্তু বৈচিত্র্যহীন, ধরা বাঁধা রুটীন মাফিক কাজ। সকালে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজ পড়া—সাড়ে ন'টা না বাজতেই স্নান করে অফিসের জন্য প্রস্তুত হওয়া—তারপর একটানা সন্ধ্যে পর্যন্ত অফিস—সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে বিছানায় বিশ্রামলাভ। কিছু পরে পুনরায় খাওয়া ও ঘুম।

কৌস্তুভ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এ'তো পশুর মত

জীবন যাপন। মানুষের বৃহত্তর জীবন, মহত্তর কাজ—তার অবসর কোথায়? পৃথিবীতে এলাম, সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা ধরিত্রী, বিচিত্র রূপ ও রস—বর্ণে গন্ধে সুষমায় মণ্ডিত—আমি কি কোন কিছুরই অধিকারী নই। কোন বৃহৎ ও মহৎ কাজেরই কি আমি উপযুক্ত নই। শুধু পশুর মত খাব, ঘুমাব আর বংশরক্ষায় ইন্ধন দেবো।

নীলার লেখা চিঠিটা নিয়ে পড়তে বসে। একবার কোলকাতা যেতে হবে, জরুরী তাগিদ। টাকাও পাঠিয়েচে। নির্বোধের মত নীলা অপেক্ষা করে বসে আছে! এ ধৈর্যের প্রতীক্ষায় সার্থকতা কোথায়। জীবনকে কল্পনা দিয়ে ভরে সুখ আছে কি! বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার যোগাযোগ না থাকলে সে কল্পনা একতরফা হয়ে পড়ে, তা'তে সুখ নেই। মানুষের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কৈশোর ও যৌবনের ভাবাবেগ দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন বাস্তবকে প্রত্যক্ষভাবে মানুষ অনুভব করতে চায়, সেখানে হৃদয়াবেগের স্থান নেই। এবার কোলকাতা গিয়ে এই কথাটাই নীলাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে আসবে।

অফিসের সময় হয়ে যায়। অফিসে কাজ করেও অবসর মিলে। সে সময়টা বই পড়ে কাটায়। কথায় কথায় তার ডিপার্টমেন্টের হাকিমের কাণে ওঠে। তলব আসে। প্রশ্ন হয়, অফিস বাড়ী নয়—তুমি অফিসে বসে

বই পড় কেন? কি বই ওটা? কি হেনরী লেভীর A philosophy for a modern man? কি বলচ সত্যের সংজ্ঞা পড়ছিলে? আর ওখানা কি বই দেখি? কি The History of Nations? না হে ছোক্‌রা ওসব কাজ এখানে চলবে না।

কৌস্তুভ তার ব্যক্তিগত বিষয়ে অনাবশ্যক ভাবে হস্তক্ষেপ করতে দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠে। কাজেই ধীরভাবে জবাব দেয়ঃ আমার কাজকর্ম করে যদি কিছু সময় পাই তা বোধহয় আমার নিজস্ব।

হাকিম তির্যকভঙ্গীতে তাকিয়ে বলেন, তাই বলে তুমি অফিস ডিসিপ্লিন্‌ মানবে না।

—দেখুন এ বিষয়ে আমি কোন কথা বলতে চাইনে।

—অর্থাৎ তুমি আমার কথা শুনবে না।

—যুক্তিহীন কথায় কাণ দিতে গেলে চলে কি করে, বলুন?

অপর কেরাণীবাবুদের দিকে সমর্থনের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হাকিম বলেন, আপনারা শুনলেন ত সব। ছোক্‌রা ভদ্রলোকের সঙ্গে এখনও কথা বলতে শেখেনি।

দণ্ডায়মান কেরাণীবাবুরা নীরবে চোখের ইঙ্গিতে হাকিম বাহাদুরের কথায় সায় দেয়।

উৎসাহ পেয়ে তিনি বলেন, না মশাই আপনারা যাই

বলুন,এ case আমি কিছুতেই ওভারলুক করতে পারি নে। আমি নিশ্চয়ই কালেক্টারকে এ বিষয়ে রিপোর্ট করব।

লজ্জা ও অপমানে কৌস্তুভের মুখে এসে সমস্ত রক্তের দ্রুত সঞ্চালন সুরু হয়। এ বিশ্রী পরিবেশের থেকে মুক্তির আশায় জবাব দেয়, আপনার ইচ্ছেতে আমি বাধা দেবো না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি একজন সামান্য কেরাণীর সঙ্গে নিজের শক্তির যাচাই করতে লজ্জা করে না। যা' করবেন নিজে করলেই হয়,আবার কালেক্টারকে জানাবার কি প্রয়োজন ?

—সে পরামর্শ তোমার সঙ্গে করবার .আবশ্যকতা দেখি নে।

কৌস্তুভ ভাবলে কথা যখন উঠ্‌লই—তখন ভাল করেই উঠুক। বলে, বিষয়টা যখন আমাকে উপলক্ষ করে, তখন ভূমিকায় আমাকে কিছু অংশ না দিলে চলে কি করে ?

—তুমি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করবে নাকি ? শুন্থন আপনারা সকলে।

কৌস্তুভের বিষয় হাকিমের কাণে তুলেছিল ওদেরই এক কেরাণী। সব হাকিম বাবুদেরই পেট্ এরকম দু' একজন কেরাণী থাকেন, যা'রা অফিসের খুঁটিনাটি কথা হুজুরের গোচরে আনেন। কাণ কথায় নির্ভর করে

হাকিমবাবু চলেন। অথচ তিনি ভাবটা দেখান এই রকম : তাঁর দৃষ্টি এত সজাগ ও প্রখর যে কোন কিছুই এড়িয়ে যায় না।

কৌস্তুভের দুঃখ হয় এই ভেবে : অভিযোগ উঠলো তারই এক সহকর্মীর কাছ থেকে। কেরাণী জাতের নিজের জাতের প্রতি সম্প্রীতি নেই। তারা আছে আপন স্বার্থসিদ্ধির তালে। কি করে একে অন্যকে অপদস্থ করে নিজের অবস্থার সুবিধে করে তুলবে সেজন্য সব সময় ব্যস্ত। এটুকু বোঝে না ব্যক্তিবিশেষের অপমানে নিজেরও অপমান!

কৌস্তুভ ধীর ভাবেই জবাব দেয়, বয়স ও পদমর্যাদার সম্মান যদি পেতে চান তবে আনুপূর্বিক সবকথা বিবেচনা করেই কথা বলবেন।

হাকিম পদমর্যাদার কথা স্মরণ করে বলেন, জান তোমাকে আমি ইচ্ছে করলে এঘর থেকে বের করে দিতে পারি।

কৌস্তুভ বলে, আমি একথা মনে করি না যে, একাজ করলে আপনার গৌরব অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। আমি নিজেই চলে যাচ্ছি। আপনারা আত্মগরিমা ও আত্মমর্যাদা আপনি নিজেই উপলব্ধি করুন, আর আপনার স্তাবকেরা দোহার দিক। আপনার মত একজন শিক্ষিত

ভদ্রলোকের কাছ থেকে এরকম ব্যবহার পাবার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আপনার নিজস্ব কোন সত্তা নেই।

কৌস্তুভ উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করে ঘর থেকে চলে আসে। বাহিরের সুনির্মল আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রাণভরে নিশ্বাস নিলে। যে সামান্য চাকরীর জন্য এত দলাদলি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে সংকীর্ণ-মনের পরিচয় দেওয়া, পদগোরবের অহমিকায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতা—সে চাকরী না করলে কি হয়। নিজের ঘরে এসে একখানা কাগজ টেনে নিয়ে, কাজে ইস্তফা পত্র লিখে দিলে, চাকুরীর আর প্রয়োজন নেই।

ভাবনা শুধু ভাই বোনের জন্য ছিল; কিন্তু তা'ও আর এখন নেই। যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে কিছুদিন পূর্বে ভ্রাতা-ভগিনীর শুভাশুভের বিষয় বিচার করেছিল, এখন সে মনোভাবের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েচে। দুঃখের ভিতর দিয়ে যদি নিজ নিজ জীবনকে একবার গড়ে নিতে পারে, তবে ভবিষ্যতে সে-ই হবে প্রকৃত মানুষ। একে অন্যের দায়িত্ব বইবার যে কল্পনা সে শুধুই কল্পনা। নইলে কোন মানুষই, কোন মানুষের জন্য অচল হয়ে বসে থাকে না। ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করবার কলকাঠি হচ্ছে মানুষের কর্মক্ষমতা। কর্মক্ষমতাই প্রধান জিনিষ। অবশ্য

ভাগ্যকে আঁকড়ে ধরে দুর্বলের সান্ত্বনা মেলে। কর্মক্ষমতায় যাঁর আত্মবিশ্বাস দৃঢ় সে কখনো এসব দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় না।

আজ যেন মুক্তির শ্বাস ফেলতে পেরে দেহ বেলুনের মত লঘু হয়ে উঠেচে। মনে কোন গ্লানি নেই, অনুশোচনা নেই—একটি সুদীর্ঘ প্রতীক্ষিত শান্তির আশায় জীবন পেঁজা তুলোর মত তার জড়তা থেকে মুক্তি পেয়ে সহজ ও স্বচ্ছ হয়ে উঠেচে। কি আনন্দ! মুক্তির আনন্দে তাই বুঝি মানুষ এত আত্মহারা হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার জন্য তাই মানুষ এত নিপীড়ন ও নিষ্পেষণ সহ্য করে। আজ আমি স্বাধীন, আমার কৈফিয়ৎ তলব করবার আর কেউ নেই—আমি মুক্ত……

কোলকাতা।

নগরীর উৎকট জনকোলাহল, যন্ত্র দানবের সুগভীর ঐক্যতান, সুসজ্জিত আলোকমালা মনে রঙের আবেশ ধরিয়ে দেয়। পৃথিবীতে দুঃখ যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। কা'রও মনে কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই; আশায় ভর করে প্রজাপতির মত ডানা মেলে এরা সবাই উড়চে।

বিরাট কোলকাতা শহরে কে কা'র তোয়াক্কা রাখে। সন্ধ্যার সময় স্নানটি সেরে শুভ্রবেশে আচ্ছাদিত হয়ে, হয়ত একটু আলোকজ্জ্বল ট্রামে করে বেড়িয়ে আসবে। নয়ত দোতালা বাসে করে, বার কয়েক শ্যামবাজার—কালীঘাট। তখন কি সে সোজা লোক—রাজার রাজা রাজাধিরাজ!

এখানে ডেপুটি গিন্নীর রোষায়িত নেত্র নেই, মুনসেফ্ গিন্নীর বৃথা অর্থের দেমাক নেই, সাব-ডেপুটি গিন্নীর হাকিমি পদমর্যাদাবোধ নেই। সাম্য ও মৈত্রীর মিলন ক্ষেত্র এই কোলকাতা, কতিপয় রাজকর্মচারীর নির্দ্দিষ্ট বেতনের দিকে নগরীর ভ্রূক্ষেপও নেই। বিরাট জনস্রোত ও কর্মব্যস্ততা এসব জিনিষ ভাববার অবসর দেয় না।

ইন্দ্রজালের মত জীবনে ব্যর্থতার সঞ্চিত বেদনা মুহূর্ত্তে অপসারিত হয়ে বুর্জোয়া সমাজের সুখস্বপ্নে মন মশ্‌গুল হয়ে ওঠে। আশা হয় অনাগত দিনের গৌরবময় আনন্দের অধিকারী হবার সৌভাগ্য তা'রও জীবনে একদিন হবে। মফঃস্বল শহরের লোকদের যেমন আশা নেই, আনন্দ নেই, অভাব নেই, অভিযোগ নেই—একটি জড়বৎ জীবন—কোলকাতায় তেমন নয়, এখানকার মানুষের প্রাণ আছে, কর্মে উদ্দীপনা আছে, উৎসাহ আছে—প্রাণ প্রাচুর্যের উচ্ছলতায় একটি সাধারণ জীবনও তার নির্দ্দিষ্ট পরিধির ভিতর মহিমান্বিত হয়ে ওঠে, একটি

পরিপূর্ণতার ছাপ পায়। বুর্জোয়া সাহিত্য বলতে এক কথায় আমরা যা বুঝি—কোলকাতা হচ্ছে তাই, আর মফস্বঃল শহরকে বলতে পারি গণ-সাহিত্যের মূর্তিমান প্রতীক। বুর্জোয়া সাহিত্যের উপাদানও কোলকাতায় মিলে ভাল—গণ-সাহিত্যের উপাদান পাই মফঃস্বল শহরে।

এই ত কর্ণওয়ালিশ্ স্কোয়ার! বেথুন কলেজ। এই রোক্কে···কণ্ডাকটার···ষ্টপ্ মে বাবুজী···ঠিক তাই, ভুল হয়ে যায়, ষ্টপে ছাড়া থামবে না। নাবতে হোলো কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটকে যেখানে বিডন ষ্ট্রীট্ ক্রশ করেচে ঠিক তার পরেই। হাতে বাসের টিকিটখানা ছিল—ফেলে দিলে। মনে হচ্ছিল এতক্ষণ টিকিট হাতে থাকাতে হাতটি অনাবশ্যকভাবে একটি জিনিষের গুরুভারে ব্যাপৃত ছিল। এখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ বোধ হচ্ছে। কোঁচাটি ভাল করে বাঁ' হাতের মুঠায় তুলে নেয়।

বেথুন কলেজের গেটের সামনে গিয়ে দরোয়ানের কাছে নাম ঠিকানা লিখে দেয়। কিছু পরেই আহ্বান আসে। নীলা প্রস্তুত হয়েই ছিল। বিরাট এক পন্টিয়াক গাড়ী, কালো মিশমিশে তার রঙ্। নীলা নিজেই চালিয়ে বাইরে নিয়ে আসে। ইঙ্গিতে কৌস্তুভকে উঠতে বলে। রঙ্ সাইড্ বাঁচিয়ে কর্ণওয়ালিশ-মাণিকতলার মোড়ে গাড়ী পার্ক করে।

নীরবে কৌস্তুভ গিয়ে নীলার পাশে বসে। স্পিডিও মিটারে স্পিডের কাঁটা ঘুরে যায়। দেখতে দেখতে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ পেরিয়ে যায়। পরিচিত স্থানগুলি চোখের পলকে অপসৃত হয়। মনে পড়ে অনেক কথা : এই ত ডাঃ রায়ের ফার্মেসী। এরই দোতালায় দাঁড়িয়ে জে, এম, সেনগুপ্তের শবের শেষ শোভাযাত্রা দেখে। ডি রতনের ফোটোর দোকান এখনও ঠিক তেমনি আছে। ঠন্ঠনে কালীবাড়ী, লাহাদের বাড়ী, বাঙ্গালী জুতার দোকান ইত্যাদি তাদের বাইরের কাঠামোকে পরিবর্তনের অবসর পায় নি—অচঞ্চল অবস্থাতেই আছে। সেনেট হলের বড় বড় পিলারগুলি, কলেজ স্কোয়ার, প্যারাগণ, প্যারাডাইস সরবতের দোকান—এখনও কি ঠিক তেমনি আছে। এখনও কি ছেলেদের ভিতর সেই চাঞ্চল্য আছে--যার প্লাবনে ছেলেরা সব কিছু পার্থিব সুখ ছেড়ে দিতে দ্বিধা বোধ করে না···ছেলেরা কি এখন দাঁড়ায় কলেজ ষ্ট্রীটের বইয়ের দোকানগুলির Show caseএর সামনে···এখনও কি ছেলেরা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা তর্কের জাল বুনে এড়িয়ে দেয়···

গাড়ী মোড়ে ঘুরে কলুটোলায় প্রবেশ করে। স্কুল অফ্ ট্রপিকাল মেডিসিনের বিরাট বাড়ীটিকে পাশে রেখে

গাড়ী চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউর প্রশস্ত রাস্তা ধরে তীব্রগতিতে চলতে সুরু করে। নীলাকে চলার নেশায় পেয়ে বসে। বৌবাজারের মোড়ে সামান্য একটু অপেক্ষা করতে হয়। তারপরই আবার ছুট্, বৌ-বাজার থানা, জি, ই, সি বিল্ডিংস্, ইন্সিওরেন্সের বাড়ী, ষ্টেটসম্যানের অফিস, ভিক্টোরিয়া হাউস, স্যার আশুতোষের পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি, কোলকাতার সর্বোচ্চ ন' তলা বাড়ীটি অতিক্রম করে বেন্টিক ষ্ট্রীটের মোড়ে থামতে হয়। চকিতে নীলা একবার কৌস্তুভের সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। পুলিশের বাঁশী বেজে ওঠে অর্থাৎ পথ পরিষ্কার—এইবার যেতে পার। নীলা পার হয়ে যায়, ব্রিষ্টল হোটেল, স্যাভয়ের ফোটোর দোকান, বোম্বে ক্রাউন, মেট্রো সিনেমা, কাফে ডি মনিকো, লেডল'র বাড়ী, স্মিথের দোকান, কন্টিনেণ্টাল হোটেল, গ্র্যাণ্ড হোটেল, ফারপো, গোলাম মহম্মদ, লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মোড়, অষ্ট্রেলিয়া হাউস, ব্রিটিশ ও ফরেন্ বাইবেল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম্, ইউনাইটেড্ সার্ভিস ক্লাব। হাওয়ার বেগে গাড়ী উড়ে চলে। নীলা বলে, কেমন লাগচে?

কৌস্তুভ সংক্ষেপে বলে, ভালই।

—তবে বুর্জোয়া সমাজকে আর নিন্দে করবে?

—জানি নে নীলা, বোধ হয় এযাত্রার সঙ্গে কোন

সমাজেরই কোন সম্পর্ক নেই। শুধু মনে হয় যদি যুগ যুগ ধরে এমনি করে চলতে পারতাম···

গাড়ী থেমে যায়। পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে লাল আলো জ্বলে ওঠে। বিলেতি মদের দোকানের বিজ্ঞাপন নিয়নস্ সাইন দিয়ে লেখা। টাইম ভর্ উইলস্ গোল্ড ফ্লেক্। রেড রোড দিয়ে পিঁপড়ের সারির মত গাড়ীর ভিড়। বেশ লাগে। নাগরিক জীবনে মাদকতা আছে। হলদে আলো তারপরেই সবুজ আলো জ্বলে ওঠে। ধীরে ধীরে গাড়ীর সারি অগ্রসর হয়। হল্ এণ্ড এ্যাণ্ডারসনের লাল বাড়ীটি বিজ্ঞাপনের খাঁচায় মেমসাহেবদের খণ্ডিত পা' সিল্কের মোজা এঁটে ষ্ট্যাণ্ডের উপর ভর করে দাঁড়ান রয়েচে—কোনটায় বা টুপির বিজ্ঞাপনের জন্য মাথাটুকু লেগে আছে, গণ্ডদ্বয়ে রুজ্ ও ওষ্ঠে লিপষ্টিকের রক্তিমাভা, সত্যি মানুষ বলে পথিকের মনে বিভ্রম জাগিয়ে তোলে—কোথাও বা জুতোর বিজ্ঞাপন, বক্ষোবাসের বিজ্ঞাপন। মুহূর্তে গাড়ী পেরিয়ে যায়। আর্মি এণ্ড নেভি ষ্টোরস্, দ্বারভাঙ্গা মহারাজার বাড়ী, রাজা ম্যানসন, আলেকজেন্ড্রিয়া কোর্ট, চিত্তরঞ্জন সেবাদনের পাশ কাটিয়ে গাড়ী চলে সোজা রসা রোড ধরে। টালিগঞ্জ ব্রিজ পার হয়ে যায়। বেশ কিছুদূর গিয়ে বা' দিকে ঘুরে গাড়ী মেঠো পথ দিয়ে চলতে সুরু করে। নগরের কৃত্রিমতা থেকে পল্লীর সুস্নিগ্ধ

মাধুর্যের ভিতর যে এত সহজে প্রবেশ করা যায় তা' না দেখলে বোঝা যায় না। রাস্তার দু'ধারে বিস্তীর্ণ মাঠ। পিচের রাস্তা পেরিয়ে গাড়ী মাটীর কাঁচা রাস্তা দিয়ে চলতে সুরু করেচে। রাস্তার আসে পাশে বাড়ীঘরের চিহ্ন নেই। ধূধূ করে শ্যামল শস্যক্ষেত্র। কৌস্তভ মোড় ঘুরে বসে বলে, এই শস্যই আমাদের দেশের প্রাণ নীলা। আমাদের দেশের সমৃদ্ধিকে যাচাই করতে হলে কোলকাতায় না গিয়ে আসতে হয় এসব জায়গায়। এই সবুজ ধানের ক্ষেতের ভিতর আমি দেখতে পাচ্ছি অনশন-ক্লিষ্ট অসহায় কৃষকের হাসির পূর্বাভাস।

নীলা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে বলে, তুমি ত এখনও বক্তৃতা ভুলে যাও নি দেখি।

—বড় লজ্জা দিলে।

—সত্যি ?

—আবারও। আমরা কোথায় চলেছি ?

—কেন ভয় হচ্ছে নাকি ?

—না ভয় নয় ; তবে যাবার জায়গাটা জানা থাকলে মানসপটে একটি ছবি এঁকে নেওয়া চলে। পথনির্দেশ মেলে, মনটা অনিশ্চিত থেকে নিশ্চিতের সীমারেখায় ধরা পড়ে।

—রস মাধুর্যে সিক্ত তোমার কথা। অজানাকে জেনে

যত রোমাঞ্চ জানাকে জেনে তত নয়। একটু ধৈর্য ধর সবই দেখতে পাবে।

নির্জন প্রান্তর। আসে পাশে বাড়ীঘরের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এরই মাঝে রাস্তার কোল ঘেঁষে একটি সুদৃশ্য দ্বিতল অট্টালিকা। বাড়ীটির চতুর্দিক ঘাসের ফ্রেমে আঁটা, ঠিক পটে আঁকা ছবির মত। ফটকের কাছে তুটি সুউচ্চ ইউকেলিপটাস্ বৃক্ষ। কিছু দূরে বাড়ীটির সিঁড়ি যেখান দিয়ে উঠেচে, তারই তুপাশে তু'টি হাসনাহান্নুর গাছ,—তুটি জানলার পাশ দিয়ে নিশ্চিন্তে শাখা বিস্তার করেচে। গাড়ীটি ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করে। আরও খানকয়েক গাড়ী এক কোণে নীরবে অপেক্ষা করছিল। নীলাও সেখানেই তার গাড়ীটি রাখলে।

ঘরের দিকে নীলা কৌস্তুভকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যায়। প্রথমেই হল ঘর, তারই দেওয়ালে আঁটা পিতলের ফলকে লেখা 'সংস্কৃতি সঙ্ঘ'। ঝক্ ঝক্ করচে। মনে হয় ঃ ব্রাসো দিয়ে ঘষে মেজে প্রতিদিন পরিষ্কার করা দৈনন্দিন কর্মের একটি অঙ্গ। হলের ভিতরে প্রবেশ করবার পর দেখা যায় অনেকগুলি চেয়ার—বোধ করি গোটা পঞ্চাশেকের কম নয়, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েচে। চেয়ার অনুপাতে লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। জন দশেকের বেশী নয়। নীলাকে দেখেই উপস্থিত সকলে আনন্দের

আতিশয্যে নিজ নিজ আসন ছেড়ে অভ্যর্থনা জানালে। একটি তরুণ ছোকরা—বয়স বছর বাইশের বেশী নয়—ছিপ্ ছিপে গড়ন—রঙটি দুধে আলতা—দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে—হাসিমুখে এগিয়ে এসে নীলাকে বলে নীলাদি তুমি এতদিন আসনি কেন? কি ভাবে যে আমার দিনগুলি কেটেচে সে শুধু আমিই জানি। দুঃখ হয় এই ভেবে, তারুণ্যকে তোমরা বড্ড বেশী ঘৃণা কর।

নীলা একটু মৃদু হেসে কৌস্তুভকে চুপি চুপি বললে: ছেলেটি আমায় বড্ড ভালবাসে।

কথা শুনে কৌস্তুভ হাসলে।

ছেলেটিকে লক্ষ্য করে নীলা বলে: এখনই জবাবদিহি সুরু করলে যে—জুলুম করবে নাকি? আমি যদি কৈফিয়ৎ না দি···

ছেলেটি বলে: জুলুম নয় নীলাদি···তোমাদের দেওয়া 'সংস্কৃতি সঙ্ঘে'র নামটি পালটে আমি রাখতে চাই 'মানব-'বেদনা-নিবারণী-সঙ্ঘ'···মানব বেদনাকে দূর না করে, সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না···হৃদয়ের বুভুক্ষা, অন্তরের বেদনা, রূপ তৃষ্ণা কা'কেও ত উপেক্ষা করে চলতে পারি না নীলাদি···এদের উপেক্ষা করার অর্থ আত্মপ্রবঞ্চনা··· আমার হৃদয়ে জোয়ারের যে উচ্ছ্বাস,তার ঢেউ কি তোমার হৃদয়তটে স্পর্শ করবার দাবী করতে পারে না···

নীলা কৌস্তুভের দিকে তাকিয়ে নির্ভীক ভাবে বলে যায়ঃ ক্ষ্যাপাটে ছেলেটির চিত্ত চাঞ্চল্যের বলদৃপ্ত ইতিহাস শুনলে ত? সত্যি এমনি বয়েস মানুষের যায়···হৃদয়-দ্বন্দ্বের ওঠানামা···পুলকের শিহরণে রোমাঞ্চের বন্যায় হাবুডুবু···প্রথম জীবনে একটিবার আসে তারপরে আর সারাজীবন মাথা খুঁড়ে মরলেও আসে না···

ইতিমধ্যে ঘরটির চারদিকের দেয়ালে বড় বড় লালচে অক্ষরে নিয়নস্ সাইন দিয়ে লেখা "Silence Please" বার কয়েক তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে আবার মিলিয়ে যায়। সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে চৌকির উপর একটি টেবিল ও চেয়ারের কাছে দণ্ডায়মানা এক অপূর্ব সুন্দরী নারীকে। তারই ঠিক পিছনে দেওয়ালের গায়ে খান কয়েক ম্যাপ পর পর সাজানো রয়েচে। একটি মানচিত্রকেই বিশেষ করে নজরে পড়ে। আয়াতনে সেটি কিছু বড়। মানচিত্রটির শিরোনামা হচ্ছে, 'দি ফিল্ড অফ্ ওয়ার'। টেবিলের উপর একটি লম্বা 'ম্যাপ্-পয়েণ্টার'।

কৌস্তুভ মহিলাটিকে দেখে পলকহীন নয়নে তাকিয়ে থাকে। রূপের যে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে তা' অতি বড় নারী-বিদ্বেষী পুরুষকেও এই মহিলাটিকে দেখে স্বীকার করতে হবে। সাংসারিক আবহাওয়ায় যে এমন মানুষের জন্ম হতে পারে তা' যেন কিছুতেই মনে হতে চায় না।

প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রতা, দীনতা, তুচ্ছতা বোধহয় কখনও একে স্পর্শ করবার সুযোগ পায়নি···হাবভাবে মনে হয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এক অপূর্ব সম্মিলনে এঁর জন্ম···বিদেশীর সৌন্দর্য ও আমাদের একান্ত নিজস্ব লজ্জা দিয়ে যেন মণ্ডিত ওর দেহ, অথচ অহেতুক কোন কিছুই ওকে মানায় না—এমনি একটি আবহাওয়ায় সে যেন তার স্বকীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করেচে···সবই কেমন প্রচ্ছন্ন, অথচ কেমন উজ্জ্বল—এইখানেই তার মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য, যাকে উপেক্ষা করা চলে না।

মহিলাটি মরালনিন্দিত কণ্ঠে বলতে সুরু করলেন : জাতির অগ্রগতির জন্য ছোটখাট ভাবপ্রবণতাকে বিসর্জন দিলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। একনিষ্ঠতাই যদি নারীর সতীত্বের মানদণ্ড হয় তবে পুরুষকেও অনুরূপ মানদণ্ডে বিচার করতে হবে; কিন্তু নারীর জন্য নজির হলো বায়োলজি। আপনারা সকলেই জানেন পৃথিবীর মধ্যে রাশিয়াই আজ একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ। সেখানে মাতা ও শিশুর আবদার সহ্য করে রাষ্ট্র। মানুষের সুবিধা ও রুচি কখনও অপমানিত হয় না। বিবাহে ধর্মের অঙ্গ ছেঁটে দিয়ে চুক্তির বর্ম পরিয়ে দেয়। প্রধান প্রশ্ন "সুবিধা" ও "অসুবিধা"। একেই ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সে দেশের বিধি নিষেধ। জীবনকে বাদ দিয়ে নিষেধ

তৈরী হয়নি, লাঞ্ছিত হয়নি হৃদয়াবেগ, পেনীলোনীয় ঐতিহ্য জাগায় না উন্মাদনা···অতীতের সাংস্কৃতিক মাপকাঠি আজ হৃদয়াবেগের চাহিদা মেটাতে অক্ষম—জীবন প্রশ্নের উত্তর মেলে না—এমন যে সামাজিক আইন কানুন তার সংস্কার প্রয়োজন···কিন্তু এসব ছাড়াও মানুষের একটা দিক আছে যা' প্রশ্নের অতীত, ভাষার অতীত, সীমার অতীত···তাকে ধরা ছোঁয়া চলে না—অদৃশ্য শক্তির হাতছানিতে হয় তার পথনির্দেশ—বাইরে তাকে অস্বীকার করলেও, অন্তরে জ্বলে তার ধূমায়িত বহ্নি···যাঁকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বললুম আশাকরি তিনি বুঝতে পেরেচেন···না আর একটু পরিষ্কার করেই বলি—মিথিলেশবাবু সেই বিলেত থেকে যখন তিনি সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষার ছাত্র, আমার পিছু নিয়েচেন···তারপর চাকরী পেলেন, দেশে ফিরলেন—কিন্তু এখনও আপনার সেই মনোভাব অটুট —সত্যি উদ্যম প্রশংসনীয়···আমিও নারীত্বের মহিমায় গর্বিত—কিন্তু উপায় নেই, আর একটি বৃহৎ শক্তির দুর্বার আকর্ষণে আমি প্রলুব্ধ—যাকে উপেক্ষা করা জীবনে হয়ত কখনই ঘটে উঠবে না···

ঘরের ভিতর যে ক'টি প্রাণী ছিল তাদের সবার দিকে কৌস্তুভ একবার ত্বরিতে চোখ বুলিয়ে নিলে। কে এই নারী? যাঁর প্রবল আকর্ষণীর টানে মিথিলেশের মত

ছেলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েও মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাত সঙ্ঘাতে জর্জরিত···কে এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যাঁর চতুর কৌশলে দেশের বুদ্ধিজীবিদের একত্র সম্মিলিত করেছেন···

কৌস্তুভ মনে মনে ভাবে ঃ মহিলাটি প্রাচ্যের নারী-জনোচিত সহজাত সংকোচকে দূরীভূত করে নিজের সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনায় দশজনের সম্মুখে এমন ভাবে তুলে ধরতে পারে, সে কি প্রকৃতস্থা নারী···না জীবনে ওর বিদেশী রক্তের স্পর্শ আছে···নগ্নতারও সীমা থাকা প্রয়োজন। সীমাকে পেরিয়ে যে বীভৎস পরিবেশ তা'তে সুখ কোথায়!

বিংশ শতাব্দীর এমনি মোহ মানুষকে ভাবিয়ে তোলে, চঞ্চল করে, দূরের নেশায় অতীতকে ভুলিয়ে দেয়···গতানুগতিক জীবনযাত্রায় সুখ নেই, অথচ নোতুন সৃষ্টির সূচনায় বিভীষিকার ছায়া দেখে···সে না পারে অতীতকে ভুলতে, না পারে বর্ত্তমানকে মেনে নিতে···

কিসের লোভে কৌস্তুভ আজ এখানে এসেচে···কিন্তু সে ত একটু আগেও জানতো না তাকে আজ এখানে আসতে হবে···নীলাই বা এ-দলে এসে ভিড়েচে কেন? দল পাকিয়ে দেশের কাজ করতে গেলে কাজের চাইতে জমকাল হয়ে ওঠে বাইরের আনুষঙ্গিক পর্ব···দশজনের

সামনে বিজ্ঞাপনার প্রলোভন ত বড় কম নয়···সত্যি সত্যি কি কিছু কাজ হয় !

কৌস্তুভ ভারী অস্বস্তি বোধ করে—কখন যে এদের সভা শেষ হবে সে খবর ওরাই জানে···এর চাইতে খোলা মাঠে বেড়ালে অনেক ভাল হোতো···বন্ধ ঘরের বদ্ধ পরিবেশ রুদ্ধ আবহাওয়াকে আরও জমাট করে তোলে···

মহিলাটি পুনরায় মিথিলেশকেই লক্ষ্য করে কথা স্থরু করলেন, অমিতাভ চাটার্জিকে যে ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েচে, তা কখনও যুক্তিসঙ্গত হয়নি। এই দণ্ডাদেশে পেটি বুর্জোয়া মনোভাবই প্রকাশ পেয়েচে। কমিউনিজম্ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া অপরাধ নয়। সমাজে নোতুন ব্যবস্থা, নোতুন জীবনাদর্শ, শ্রমের উপযুক্ত মুল্য, ডালরুটীর সংস্থানের নোতুন পথের সন্ধান একমাত্র কমিউনিজমই দিতে পারে। ক্যাপিটালিজম যদি এসব চাহিদা মেটাতে পারত তবে আর আজ ঘরে ঘরে অসন্তোষেরই বহ্নি দেখা যেত না। শুধু দুঃখ হয় এই ভেবে ঃ আপনারা যাঁরা দেশের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসন পেয়েচেন, তাঁরা ক্যাপিটালিজমের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে সমাজে নয়া ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুখস্বপ্ন এখনও ত্যাগ করতে পারেন নি। মুনাফার লোভ সংবরণ করে দেশহিত ব্রতে

আত্মোৎসর্গ করতে সকলে চাইবেন কেন? কলকারখানা ইত্যাদি সব কিছু রাষ্ট্র হাতে নিয়ে শ্রমের হার বিলি বণ্টন করবার স্বপ্ন বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর অত টাকা রাষ্ট্রকে একসঙ্গে দিতে হলে রাষ্ট্র ফতুর হবে। আসল কথায় ফিরে আসা যাক্, বুরোক্রেসীর চরম শিক্ষাই আপনারা পেয়েচেন···নিজের স্বার্থের খাতিরে বিচারের নামে যে অবিচার আপনারা চালাচ্চেন তা' বাস্তবিকই অনুধাবনযোগ্য! আপনি ত সেদিন সিভিলিয়ান হয়েচেন···এখনি যে মনোভাবের পরিচয় দিচ্চেন তা'তে Steel frame of British Indiaর মর্যাদা যে ভবিষ্যতে অক্ষুণ্ণ থাকবে সেবিষয়ে আর সন্দেহ নেই!

এতগুলো কথা শুনেও মিথিলেশ বিনা প্রতিবাদে চুপচাপ বসে থাকে। সে যেন এ জগতে নেই। কথায় তার মন বসে না। কথার অতীত, শ্রবণের অতীত, গ্রাহ্যের অতীত এক বিচিত্র দেশে তার মন উড়ে চলেচে··· দেশ, কাল, পাত্র, সমাজ কিছুই ওর মনের নাগাল পায় না···চিরদিনই এমনি বেপরোয়া তার স্বভাব · ছেলেবেলা থেকে যা' সে কামনা করেচে—একান্তভাবে তা' পাবার জন্য সমস্ত দেহমন নিয়োজিত করেচে···সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী একথা সব সময়ই তার কাছে স্বতঃসিদ্ধ···সাফল্যের বিজয়টীকা নিজে এসে তার দুয়ারে হানা দিয়েচে···বুদ্ধি

ও শ্রমের সংমিশ্রণে জয় যে হবেই একথা তার চাইতে আর কেউ ভাল জানে না···

প্রথম দেখা হয় রেল গাড়ীতে অকস্‌ফোর্ড থেকে লণ্ডনের পথে। মিথিলেশও উইক-ডেজ-এ লণ্ডন চলেচে। অকস্‌ফোর্ড থেকে লণ্ডন রেলে মাত্র ষাট মিনিটের পথ। এই ষাট মিনিট সময় মিথিলেশ তার চক্ষুদ্বয়ের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করবার যথেষ্ট সময় পেয়েচে। আর এই সময়ই সে প্রথম উপলব্ধি করেচে এমন কমনীয়তা, এমন মুখশ্রী আর এমন সৌন্দর্য বোধ হয় বাঙালী ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন জাতের হয় না···তারপর সুযোগ বুঝে পরিচয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পথে···কিন্তু মহিলাটি চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চেন—কেনসিঙটন্ হাই ষ্ট্রীট, ব্রোম্‌টন রোড, অকস্‌ফোর্ড ষ্ট্রীট, রিজেণ্ট ষ্ট্রীট, বণ্ড ষ্ট্রীট, পিকাডিলি···বোধহয় শপিং করতে বেড়িয়েচেন··· ধীরে ধীরে কথাবার্তায় জানা গেল সাউথ কেনসিঙটন—ক্রমওয়েল রোডের Natural History Museum-এ-ধারে প্রায়ই তিনি আসেন···মিথিলেশ কণ্ঠে উৎসুক্য প্রকাশ করে বলে, বোটানী রিসার্চ করচেন বুঝি··· ···অনাবশ্যক কৌতূহল আশাকরি মাপ করবেন···মহিলাটি ওর কথা শুনলেন কিনা ঠিক বোঝা গেল না—শুধু বললেন: একস্‌জিবিসন রোডের সায়েনস্ মিউজিয়ামে

মাঝে মাঝে যাই···মিথিলেশ বলে, ওঃ···অকস্‌ফোর্ডে famous "Eights Week" আরম্ভ হচ্চে সামনের ১৯শে মে'···আপনার নেমন্তন্ন রইল···নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গদানে আমাদের বঞ্চিত করবেন না ··মহিলাটি ওষ্ঠে কৌতুকের আভাস দিয়ে বলেন, আরও অনেকে আছেন বুঝি··· মিথিলেশ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে বলে : না ঠিক তা নয় —অনেকটা গৌরবে বহুবচন···মহিলাটি এক জায়গায় এসে থেমে গিয়ে বললেন : Exuase me for a minute. মিথিলেশ লক্ষ্য করে, পাবলিক্ টেলিফোন অফিস। রিসিভারটি তুলে নিয়ে : Hallow Grrard 2982 please—দুটো প্রথম শ্রেণীর টিকেট অনুগ্রহ করে···পিকাডিলির লণ্ডন প্যাভিলিয়নের টেলিফোন নম্বর মিথিলেশের মুখস্থ···পিকচার থিয়েটারে পর্দায় ছবি মুখর হয়ে ওঠে। তারপর একসময় শেষ হয়ে যায়···বিদায়ের পালা···মনে হয় এইত সেদিন···তখন ভেবেছিল রুমা মনের কোরকে কিছু ছবির আঁচড় কেটে দিয়ে গেলেন যাকে সঠিক ভাবে সাজালে রোমান্সের আভাস পাওয়া যায়···হয়ত ধারণাটা সবই ভুল···কেন এমন হয়! বিশেষ করে সুন্দরী মেয়ের প্রাণ এত কঠোর হয়—কেন? দেশে থাকতে আরও অনেক মেয়ে দেখেচে সে। সেখানেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম বড় একটা দেখেনি···কিন্তু রুমার

জীবনে পাশ্চাত্যের ছোঁয়াচ লাগায় পুরুষকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত দিয়ে পরম কৌতুক লাভের কৌশল ভাল ভাবেই শিক্ষা লাভ করেচে···সে চায় জীবনের ছন্দে ছন্দে পুরুষকে নানা রঙে নাচাতে···সেইখানেই আনন্দ—সেইখানেই তার সার্থকতা···অদ্ভুত নারী···বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি···নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ···কি ওর নীতি···কি চায় সে এজগতে···জীবনকে বাদ দিয়ে দেশ নয়, আবার দেশকে বাদ দিয়েও জীবন নয়···দুই চাই···কিন্তু সামঞ্জস্য রেখে··· এক-কে বাদ দিয়ে, অপরকে আঁকড়ে ধরলে একদেশ-দর্শিতা দোষ স্পর্শ করবে···নারী যদি পুরুষকে অস্বীকার করে, দেশ নিয়ে মেতে ওঠে তাহ'লে সাইকোলজি কি বলে···হয় ওর মন অন্য কোথাও বাঁধা আছে নয়ত কা'রও কাছ থেকে তীব্র আঘাত পেয়েচে, যা'র জন্য পুরুষকে ঘৃণা করা ওর স্বভাব···সকল মেয়েমানুষেরই প্রধানত যা' একান্ত কাম্য "অবলম্বন"···সেই অবলম্বনকে বাদ দিলে তা'র জীবনে আর বাকী রইল কি···সে যে নিঃস্ব, রিক্ত, এতবড় এই বৃহৎ সংসারে একা···

সভাসমিতিতে কৌস্তুভের কোনদিনই তেমন বিশ্বাস নেই। কোন সম্মিলনীতে পরনিন্দা চর্চা বা একে অন্যকে

কটাক্ষ করার নীতিই যে মুখর হয়ে ওঠে সে কথা কৌস্তুভ ভালভাবেই জানে। মহিলাটির রূপের প্রশংসা মনে মনে করলেও তাঁর কথাবার্তার উগ্র ভঙ্গিমায় সে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়। মেয়েমানুষের শালীনতার পরিধিকে অতিক্রম করবার দুঃসাহস, কোথা থেকে পেল এই নারী! জীবনে কোন্ বলে বলীয়ান হয়ে আজ তিনি মহীয়সী নারীর স্থান অধিকার করতে ব্যাগ্র হয়ে উঠেছেন! চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি, কথাবার্তায় সতেজ ভঙ্গী, স্বীয় মতবাদ প্রচারে অটুট নিষ্ঠা, চালচলনে সাম্রাজ্ঞীর অনুকরণ— মানুষটির অন্তরের রূপ প্রতিফলিত হয়ে মানুষটির নিজস্ব সত্বাকে জানিয়ে দেয়···এমন নারীকে দূর থেকে ভালবাসা যায় কিন্তু ঘর করা চলে না···হায় মিথিলেশ···তোমার জন্য দুঃখ হয়···

নীলাকে একটু ঠেলা দিয়ে কৌস্তুভ বলেঃ নীলা চল, আমরা যাই।

নীলাও উঠে পড়ে।

কৌস্তুভ বলেঃ চল একটু গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে বাড়ী ফেরা যাক্।

নীলার গাড়ী ছুটে চলে তীব্র গতিতে। হেষ্টিংসে এসে গতির তীব্রতা ষাট থেকে সত্তর মাইলের মাঝামাঝিতে দাঁড়ায়।

প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে এসে গাড়ীর গতি মন্থর করে দেয়। ঠিক যেন মানুষ পায়ে হেঁটে চলেচে। গঙ্গার শীতল বাতাস ঝিরঝির্ করে এসে নিদাঘের শ্রান্তিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। সান্ধ্য-সমীরণ কলকাতার একটি বৈশিষ্ট্য। দিবসের উত্তাপের ওঠাপড়ার সঙ্গে রাত্রির উত্তাপের কোন একতা নেই।

পায়ে হাঁটা পথিক, ট্রাম বাসের বাবুরা ও ক্যাপিটালিষ্ট বাবুরা নিকটে কোথাও গাড়ী পার্ক করে প্রজাপতির মত ইতস্ততঃ ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ আচার্য পি, সি রায়কে একটি যুবকের স্কন্ধে ভর দিয়ে ও অপর হাতে লাঠি নিয়ে—ঠিক অসহায় শিশুর মত—পথ চলতে দেখা যায়। গাড়ী বেতার জগতের মাস্তুলের নৈকট্য পেরিয়ে অনেকটা চলে এসেচে।

আচার্য রায়কে দেখে মুখ খুললে কৌস্তুভ: হায় আচার্য দেব, তোমার একি দশা···মনে হয় তুমি কত অসহায়···দিকভ্রষ্ট নাবিকের মত পথ হারিয়ে পথ চলেচ ···সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সংযমের যে পরাকাষ্ঠা দেখালে তার হিসেব-নিকেশের খতিয়ান কেউ রাখলে কি না—সেদিকে তুমি ভ্রূক্ষেপও করলে না···কি যে শান্তি পেলে, কোন্ নোতুন সত্যের যে প্রতিষ্ঠা করলে, কেন যে সারা জীবন ভরে এই কঠোর তপস্যা—জনসাধারণের কাছে

আজও তা' কুহেলির আবরণে আবৃত···প্রকৃতির বিরুদ্ধে ঘোষণা করলে যুদ্ধ, জয় করলে তারুণ্যের উচ্ছলতা, যৌবনের হৃদয়াবেগ, ধনিকের বিলাসিতা···নিঃশেষে নিজেকে রিক্ত করে দিয়ে ফকির সাজলে···সাবাস্, তোমার চরণে নমস্কার···

নীলা সংক্ষেপে জবাব দেয়ঃ ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ···আচার্যদেবকে দেখলে বৈরাগী মন উদাস হয়ে ওঠে··· মনে হয় জ্ঞানে শান্তি, ধনে অশান্তি···

কৌস্তুভ বলেঃ আর দার্শনিকতা নয় নীলা, চল কিছু খাই—বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে···দেখো আবার খেতে বসে মেয়েদের সনাতনী নাটক নভেলী বক্তৃতা ফেঁদে বোসো না···যা' ইচ্ছে তাই খাব—এটা খাও ওটা খাও বোলো না কিন্তু···

উত্তরে নীলা একটু হাসলে···

পেট ভরে কন্টিনেন্টাল হোটেল থেকে খেয়ে, আবার তারা চলে···

এবারে সোজা লেক। জ্যোৎস্না বিধৌত গভীর রাতে আপনি কি কখনও লেকের শান্ত, স্নিগ্ধ ও ভাবগম্ভীর জলরাশির রূপালী মাধুর্য দেখেচেন! এই লেকের জলে সমাজনেতাদের দ্বারা অত্যাচারিত ভালবাসা মুক্তির পথ খুঁজে বের করেচে···পদে পদে শৃঙ্খলিত, বিধিনিষেধের

কঠোর অনুশাসনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত বে-আইনী ভালবাসার সমাধিক্ষেত্র এই লেক—মনের অতীত রাজ্যে যে নির্মানসিক জগতের খেলা চলে তারই কণ্ঠরোধ হয় এখানে···নীতিবাগীশরা দূর থেকে স্বীয় প্রতারিত জীবনের নিষ্ফলতায় মনুষ্যদ্বেষী আইন প্রণেতা হিসেবে আত্ম-গরিমার জলন্ত মতবাদটি আরও একটু উজ্জ্বল করে দিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসেন···নীতি জন্মলাভ করে গূঢ় দুরভিসন্ধি হতে···সভ্য জগতে নগ্নতার চাইতে মৃত্যু শ্রেয়ঃ, কিন্তু প্রকৃত শিল্পী চান অন্তরের আসল রূপটির বহিঃ প্রকাশ—সেখানেই তার সার্থকতা···

নীলা ও কৌস্তভ বসলে ঘাসের ওপর দু'খানা রুমাল বিছিয়ে।

দুজনেই স্তব্ধ। পৃথিবীতে যেন কোন ভাষা নেই। শুনেচি অন্তরে অন্তরে যখন কথা হয় তখন ভাষার প্রয়োজন হয় না। এই নীরবতাই অন্তরে তোলে সহস্র কথার ঝড়।

প্রবাদ আছে মেয়েদের মন বড় চঞ্চল, গভীর কোন চিন্তা তাদের দিয়ে চলে না। আর নীলা ত বিশেষ করে কথার ফুলঝুরি—চুপ করে থাকা তার স্বভাবই নয়। বললে, কি ভাবচ, বলত ? জীবনটা কি শুধু চিন্তা ভাবনা আর কাজ করবার জন্যই—জীবনে কি আর কিছু নেই ?

—ভাবচি : ম্যানিনের কথা, মানুষের ভাবপ্রবণতার ওপর 'ব্যভিচার', 'অসৎসঙ্গ', 'অবৈধ প্রণয়'—এই সব কতগুলো আইনী ভাষা প্রয়োগ করা হয়েচে।

"কার্ল এবং অ্যানা একে অন্যকে এত গভীরভাবে ভালবাসত যে তাদের মরবার ইচ্ছার দ্বারাই তারা তাদের জীবনের পরম পবিত্র মুহূর্তকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল ···তাদের অন্তর একই ধারায় বয়ে গিয়েছিল"—কিন্তু যেহেতু গ্রন্থকার তাদের উভয়কে স্বামী স্ত্রী রূপে দেখাতে যান নি, তাই নীতিবাগীশদের ভাষায় তারা হয়ে উঠেছিল ব্যভিচারী। অবশ্য প্রণয়টা অবৈধ। কি করে একে বিধিসিদ্ধ করা চলে? সত্যি প্রণয় এত পাপ যে ঠিক ঋতুকালীন বাতাস ও স্রোতের মত—ঠিক জোয়ার ভাটার মত···

নীলা বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়চে তার কিছু পরেই আছে: মানুষ ব্যভিচারী হয় কেন? কারণ তারা অসুখী—জীবন-যুদ্ধে পরাজিত, সুখ স্বপ্ন দ্বারা প্রতারিত।—আর যে ভালবাসার মৃত্যু ঘটে অথবা যে ভালবাসার স্বাদ কোনদিনই মানুষ পায় নি তারই জন্য তার লোলুপতা···আইডিয়াল স্টেটে পরস্পর পরস্পরকে সত্যি সত্যি ভালবাসবে···মানুষের এই সহজাত বৃত্তিকে "অপবিত্র" আখ্যা দেওয়া বাস্তবিকই করুণ—কিন্তু তাই বলে একে অসহনীয় বলা চলে না···

কৌস্তুভ বলে, মানুষ বড় না আইন বড়—মানুষ আইন প্রণয়ন করেচে, না আইন মানুষ প্রণয়ন করেচে··· সমাজশৃঙ্খলাকে বজায় রাখতে গিয়ে যখন মানুষের চাইতে আইন প্রাধান্য লাভ করে তখন দুঃখ হয়···আইনের সীমাগণ্ডী মানুষ তখনই অতিক্রম করতে বাধ্য হয় যখন পারিপার্শ্বিক প্রগতিকে আইনী শাখা উপশাখা দ্বারা আইনকে ধরে রাখতে সক্ষম নয়···

নীলা কৌস্তুভকে মৃদু আঘাত করে বলে, ওই দেখ আকাশে কি বড় চাঁদ উঠেচে···সত্যি কি তীব্র লাগচে আজ চাঁদকে···মনে হয় লোরেঞ্জো-জেসিকা এপিসোডের মত বলে ফেলি :

"এমনি নিশীথ কালে,
বাতাস যখন বনানী সখীরে স্পর্শিল মৃদুকরে,
প্রেমচুম্বন দিতে ;
এমনি নিশীথ রাতে,
বুঝি ট্রয়লাস্ দাঁড়াইয়া একা ট্রয় নগরীর
উচ্চপ্রাচীর 'পরে,
গ্রীক শিবিরের পানে চাহি শোকে ফেলিল
দীর্ঘশ্বাস,
ক্রেসিড ঘুমায় যেথা !"

কৌস্তুভ বলে ঃ

"আজি এই স্নিগ্ধা রজনীতে
রাণীর বেশে চাঁদিমা
ঊর্ধ গগনে নিঃসীম নীলে রয়েছে
বিরাজমানা—
ওগো নারী তোমারেই
বসায়েছে পুরুষ,
প্রিয়ার আসনে—ভাবি
ইহাই সত্য নিষ্কলুষ"···

নীলা কৌতুকে ছোট্ট হয়ে যায়। বলে, বল না গো. এমনি বাছা বাছা আরও গোটাকয়েক কোটেশন।

—তোমার নয়নে স্বপ্ন, হৃদয়ে দ্বন্দ্ব, তনুতে ছন্দ··· ওই পদ্মপলাশ লোচনে···মাঝে মাঝে তুমি জনারণ্যের মাঝে হারিয়ে যাও···ক্ষণে ক্ষণে তোমার কৌতুকের উচ্ছলতা নিভৃতলোকের অনুচ্চারিত কামনা পোষাকা অবগুণ্ঠন সরিয়ে নেয়···আবার সময় সময় ভাষা স্তব্ধ, বাণী মূক, নিবিড়তা গভীর হয়ে ওঠে···আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি···প্রেম সত্য···বহু পুরাতন···বিংশ শতাব্দীর বিশ্লেষণী মন শুধু প্রেম নিয়ে তৃপ্ত নয়···প্রেমের ভিতর প্রেমাতীতকে চাই নে···দেহের ভিতর দিয়ে দেহাতীতকেও নয়···অখণ্ড মানুষকে আমরা চাই

প্রয়োজনের খাতিরে…বহু ভাবাবেগের মধ্যে প্রেম আজ একটি ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছুই নয়…এই শতাব্দীর ছেলেমেয়েরা পৃথিবীর নাটকীয় রঙ্গমঞ্চে এক একটি ভূমিকা গ্রহণ করেচে…তাদের দায়িত্ব অনেক, চিন্তা সুদূরপ্রসারী, ভাবনা দিগন্তজোড়া…

সাত

সকাল বেলা। ঘুম থেকে উঠতে অনেকটা বেলা হয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে কৌস্তুভ গা' মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠি উঠি করচে। মেসের অনেকেই উঠে যে যা'র কাজে চলে গেছে। এমন সময় পাশের বাড়ী হতে একটা গোলমালের শব্দ শোনা যায়।

বোধকরি কলহটা বেধেচে পিতাপুত্রের মধ্যে। পিতা সপ্তমে গলা চড়িয়ে থেকে থেকে হুঙ্কার দিচ্ছেন; আর ছেলেটি ধীর, স্থির ও সংযতভাবে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে।

পিতা বলচেন, তোমাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেচি, লেখাপড়া শিখিয়েচি—তোমার পরিবারের উপর কোন দায়িত্ব নেই···যাহোক্ নোতুন কথা শোনালে কিছু···

ছেলেটি বলচে, নিজের ছেলেকে শিক্ষা দেবার ভিতর পিতার কোন স্বতন্ত্র কৃতিত্ব নেই···ছেলে হলে শিক্ষা দিতে হবে এ ত সহজ কথা···দায়িত্বের ভার বইতে গিয়ে আমি আমার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করতেপারি নে···আমার ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে জীবনকে পঙ্গু করে একটি জড়বৎ কাষ্ঠ-পুত্তলিকা সাজতে পারব না···

পিতা একটু গম্ভীরস্বরে বললেন, আমাদেরও মা-বাপ ছিলেন, আমাদেরও ভাইবোন ছিল—কিন্তু কোন দিন ঘুণাক্ষরেও তোমাদের মত এসব পাণ্ডিতিক বচন মনের কোণে স্থান পায় নি···সকাল থেকে উদয়াস্ত গাধার মত খেটেছি— উপার্জনের যা' কিছু নির্বিচারে এনে বিলিয়ে দিতাম···এর জন্য মনে কোনদিন অনুতাপ জন্মায়নি···

ছেলেটি বলে, এ শুধু কালচারের অভাব—পৃথিবীকে বড্ড সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখেছেন আপনারা—আপনার ভিতরে যে মনীষা ছিল, যে প্রতিভা ছিল, যে ব্যক্তিত্ব ছিল—তাকে কণ্ঠরোধ করে আত্মহত্যা করেছেন···সকল অপরাধের ক্ষমা থাকলেও এ অপরাধের ক্ষমা নেই···যে প্রতিভা বিকশিত হতে পারতো দিগ দিগন্তে এবং যে প্রকাশ মহিমার গুণ-কীর্তনে বিশ্বজগতের স্তুতি আপনার ভাগ্যে জুটতো তা' থেকে বঞ্চিত হয়ে স্ত্রীপুত্র পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আপনার বিরাটত্বকে খর্ব করেছেন···এর জন্য দায়ী আপনি নিজে···

এরপর আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না···এক-টানা খানিকটা নিস্তব্ধতা···

কৌস্তভ তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে—ন'টার সময় নীলার ওখানে যেতে হবে—সেভ্ করবার সরঞ্জাম নিয়ে বসে পড়ে—সেভিং ব্রাসটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে

ত্বরিত বেগে গালের চতুষ্পার্শ্বে বুলিয়ে নেয়—ভাবনার শেষ নেই—রাজ্যের যত ভাবনা সব এসে এই ছোট্ট মাথাটির ভিতর ভিড় করে আছে—কেন বর্তমানের সঙ্গে অতীতের এই দ্বন্দ্ব—অতীতের জীবনযাত্রায় মানুষের নাকি শান্তি ছিল—এখন এসেচে অসন্তোষ, বিদ্রোহ, আত্মসমীক্ষার প্রশ্ন—সবাই নিজেকে উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োগ করতে চায়—কিন্তু পারে না কেন? আসল সমস্যাটা কোথায়? বিবর্তনের রঙীন নেশায় মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত হয়েচে—অতীতকে ঝেঁটিয়ে দিয়ে তারা চায় নোতুন সংস্থাপনা—অতীতের সাধ্য নেই যুগসন্ধির দাবী মেটায়—দিকে দিকে বিদ্রোহের বহ্নি—

ধীরে সাবানটা গালে বুলিয়ে নেয়—মানুষ হয়েও মানুষ, মানুষ নয়—মানুষ পশুরও অধম—মানুষের সঙ্গে মানুষের শ্রেণী বৈষম্য—কিন্তু কেন? ঠিক বুদ্ধের মত প্রশ্ন। বুদ্ধদেব চেয়েছিলেন পৃথিবী থেকে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুকে দূর করতে—আধুনিক তরুণরা চায় শ্রেণী বৈষম্যকে মূলচ্ছেদ করতে—পৃথিবীতে আজও আছে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু—কিন্তু শ্রেণী বৈষম্য? সে কি লোপ পাবে? শ্রেণীর স্বার্থ সংঘাতে—মুনাফার লোকসানে মালিক হুঙ্কার ছাড়বে, গর্জন করবে, ভয় দেখাবে—অবশেষে অর্থ দিয়ে বশ করবে রাষ্ট্রের কর্ণধারকে—সবশেষে স্কীম

হোলো পশু—নেতা উঠলো কঁকিয়ে কেঁদে—আশ্বাস দিল শ্রমিকদের : ভয় পেয়ো না—এবার সংগ্রাম হবে নোতুন পরিকল্পনায়, নোতুন পদ্ধতিতে—

একই মানুষ জাত—কেউ বা দেয় রাস্তা ঝাড়ু—কেউ বা হাওয়াগাড়ী চড়ে হাওয়া খায়—কেউ বা মূলধন খাটিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য ক্রয় করে—কিন্তু কেন? যোগ্যতাই যদি মাপকাটি হয়, তবে ঝাড়ুদার যোগ্যতা অর্জন করবার সুযোগ পেল কোথায়? সে তার বরাত। ঝাড়ুদার হয়ে জন্মায় কেন? আমার অর্থ আছে—আমি পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য ক্রয় করবো না ত, করবে কে? বুদ্ধিমান লোকেরই মূলধন থাকলে তাকে খাটান প্রয়োজন···

অসম্ভব, অসম্ভব—রাষ্ট্র করবে ব্যবস্থা তবেই হয়েচে—ভারতের মত দেশে রাষ্ট্রের মুখ চেয়ে বসে থাকলে চিরকালই বসে থাকতে হবে—শ্রমিকের মুখপাত্র হওয়া উচিত শ্রমিকেরই—কিন্তু আমাদের দেশে ত তা' নয়—কি ভীষণ দুরবস্থা। নিজের ভাল মন্দ জানে না, নিজের দুঃখ-বেদনারও তাপ উত্তাপ জ্ঞান নেই—এমন যে শ্রেণী সে করবে তার মঙ্গল চিন্তা—মুখপাত্রের কথায় ওঠে, বসে, হাসে, কাঁদে—নিজেদের শুভাশুভ বিচার করবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই—হায়, হায় এই শ্রেণীকে মার্জিত করতে না জানি কতযুগ লেগে যায়—বৈজ্ঞানিক ভিত্তির দোহাই

দিয়ে শ্রেণীহীন সমাজের পরিকল্পনা সুখকর হতে পারে—মার্কসবাটা মিশিয়ে শব্দবিন্যাসের কৌশল ঝাঁজাল হতে পারে—নিরালম্ব শ্রমিকেরা মুখপাত্রের আইডিয়াকে সরলভাবে মেনে নিতে পারে—কিন্তু তারপর—তারপর কি ?

না, আর সময় নেই। সোয়া ন'টা বেজে গেছে।

* * * *

এই যে নীলা—এমন চুপচাপ বসে আছ—হাতে কোন কাজ নেই বুঝি—কৌস্তুভ এক নিঃশেষে বলে যায়।

নীলা প্রত্যুত্তরের পরিবর্তে টেলীগ্রামখানি কৌস্তুভের দিকে এগিয়ে দেয়।

কৌস্তুভ টেলীর উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, তবে ত তোমাকে আজই যেতে হয়। উৎসাহ একা একা তোমার বৌদিকে নিয়ে নিশ্চয়ই খুব বিপদে পড়েচে। তুমি গেলে তাও খানিকটা বল-ভরসা পাবে—

নীলা ক্ষুণ্ণস্বরে বলে, তুমি যাবে না—

—নিশ্চয়ই, প্রয়োজন হলেই যাব,—তবে এখন যাবার এমন কোন তাড়া দেখি না। প্রথমে তুমি গিয়ে অবস্থাটা আমাকে জানিও—তারপরেই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে ফেলব। এখন তোমার কি কি প্রয়োজনীয় কাজ আছে, তাই বলো—

নিরাসক্ত কণ্ঠে নীলা জবাব দেয়, কাজ—কোথায় এমন কোন কাজ ত দেখি না—

—কেন, কিছু কেনা-কাটি নেই—বন্ধু-বান্ধব নেই—দেখাশোনা করবে না—

নীলা একটি দীর্ঘ 'হুঁ' বলে থামিয়ে দিলে কৌস্তুভের উচ্ছ্বাসকে।

কৌস্তুভ সহজভাবেই উত্তর দেয়, তুমি রাগ করলে চলবে কি করে, বল? আগামী কাল আমায় নোতুন কাজে যোগ দিতে হবে। দৈনিক কাগজের আফিসে কাজ—ঝামেলা বুঝতেই পারচ। প্রথমেই উৎসাহের অভাব দেখলে সম্পাদক মশায়ের কোপানলে দগ্ধ হতে হবে। আমি একটু শান্তি চাই, নিরুদ্বেগে কাজ করে যেতে পারি সেই চেষ্টাই ত করা উচিত। কেন, তুমিও কি তাই চাও না?

নীলা বলে, কেন দীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা করচ। আমি কি কিছু বলেচি—

কৌস্তুভ বলে, প্রসন্ন মনে উত্তর দেও—তোমার কথায় যে প্রচ্ছন্ন সুরটুকু আছে, তা আমি ধরতে পেরেচি—

নীলা হেসে জবাব দেয়, মনস্তত্ত্বের কালচার বেশ জোরকদমেই সুরু করেচ দেখচি···আচ্ছা, চল প্রথমে

একটু মার্কেটে যাব···তারপর এখানে ওখানে···চল, আর দেরী নয়···

কৌস্তুভ বলে, আমি সব সময়ই প্রস্তুত।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে বাজারে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় অনেক জিনিষ কিনলে। শেষে ব্রাইট ষ্ট্রীটের ব্রাইট বাড়ীতে রুমা দেবীর কাছে।

রুমা দেবীকে সেদিন তাদের সভায় নিজ মূর্তিতে দেখলেও কৌস্তুভের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। পরিচয়ের পর কৌস্তুভ বুঝতে পারলে ব্যক্তিত্ব ছাড়াও রুমা দেবীর তীব্র আকর্ষণী শক্তি পুরুষ হৃদয়কে দোলা দিয়ে যায়—অননুভূত কোন্ গোপন ব্যথায় হৃদয় টন্‌টনিয়ে ওঠে—তার স্বরূপকে ঠিক বোঝা যায় না—শুধু অনুভব করাই চলে···

নীলা একটু গর্বিত ভঙ্গির সঙ্গে বলে, রুমাদি আমি দার্জিলিং চলেচি, বৌদির কনফাইন্‌মেণ্ট পিরিয়ড—দাদার তার পেয়েচি শিগ্‌গীরই চলে যাবার জন্য···অনেক সময় অনেক জরুরী কাজ করিয়ে নিতে পারবে এঁকে দিয়ে···

রুমা দেবী বেশ পরিচয়ের সুরেই বললেন, আপনার খবর অনেক আগেই পেয়েচি—আজ সাক্ষাৎ পরিচয়ে সত্যি সত্যি আনন্দ পেলাম। আমাদের এখানে বক্তৃতা-বাগীশ আছেন অনেকে, কিন্তু আসল কাজ করবারই

লোকের অভাব···আপনাকে পেয়ে নিশ্চয়ই আমাদের কাজ এগিয়ে যাবার পক্ষে সুবিধে হবে···

পক্ষান্তরে কৌস্তুভকে বলতেই হোলো, আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতা দিয়ে আপনাদের সমিতির যতটুকু সাহায্য করতে পারি—তা' সব সময়ই করব···

দিন কয়েক আগে এই বিশেষ মহিলাটির নীতি ও কর্মের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছিল এবং নীলা এই দলে ভিড়ে যাওয়ায় মনে মনে যে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল, তা' যেন এই সরল স্বীকৃতিতে অনেকটা প্রশমিত হোলো।

নীলা বলে, রুমাদি আর দেরী নয়—এখন তবে আসি। আমার জিনিষপত্র সব অগোছাল হয়ে পড়ে আছে! এখনও কিছুই ঠিক হয়নি···

তারপর কৌস্তুভকে এক সময় নীলাকে ষ্টেশনেও তুলে দিয়ে আসতে হলো। কোলকাতায় কৌস্তুভের জীবনযাত্রা চল্‌ল সম্পূর্ণ এক নোতুন ধারায়। কাগজের অফিসে কাজ। দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত—কেবল অনুবাদ করতে হয়। এখন মনে হয় পৃথিবীতে ভাষার তর্জমা করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। কাজে একঘেঁয়েমি থাকলেও বৈচিত্র্য আছে।

রবিবার দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম। বিশ্রাম অর্থে

অফিসের কাজ থেকে বিরতি। ব্যক্তিগত খেয়ালী কাজেই সে ছুটীর দিনটি কাটায়।

রুমা দেবীর ব্যক্তিত্ব কৌস্তুভকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করেচে। সে যন্ত্রচালিতের মত রবিবার দিন রুমা দেবীর কাছে ছুটে যায়। তার কাজে সাহায্য করে —খেয়াল মাফিক ফাই-ফরমাস খাটে।

খিদিরপুরে ওদের একটি অফিস আছে। রবিবার দিন অফিসটি খালিই পড়ে থাকে। রুমা দেবী কৌস্তুভকে এই জায়গাটিতে প্রায় রবিবারেই নিয়ে আসেন। এখানে বসে শ্রমিকদিগকে তেজস্বী লেখনীতে সাম্যবাদের আশু উজ্জ্বল পথের সন্ধান বাতলিয়ে দেয়। অবশ্য খুবই গোপনে। কোন কোন দিন বা একে অন্যের খবরাখবর আদান প্রদান করতেই ছুটীটা কেটে যায়। এসব কাজে আবেগের চাইতে উন্মাদনা বেশী।

রুমা দেবী কৌস্তুভের লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ঠিক এমনটিই তিনি চান। লেখাতে আছে প্রাণের দরদ। "নোতুনের স্বপ্ন" শীর্ষক অধ্যায়টির প্রশংসায় চতুর্দিক হতে অজ্ঞাতনামা লেখকটির স্তুতিতে তাদের সঙ্ঘের ভিতর বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়।

কৌস্তুভ আরও তীক্ষ্ণ শ্লেষ দিয়ে লিখে যায়ঃ হাজার হাজার মানুষ দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে,

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীর মানুষকে প্রতিপালন করতে বাধ্য হচ্ছে···কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই কি আত্মপ্রকাশের অধিকার নেই···এই প্রতিকূল অবস্থার জন্য দায়ী কে? ভাল খাওয়া, থাকা, শোয়া ও উত্তম শিক্ষালাভ সম্বন্ধে প্রত্যেক মানুষেরই একটা দাবী আছে···সেই দাবীকেই আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে···ধনিক শ্রেণীর সমাজের মঙ্গল চিন্তার সময় কোথায়···আমাদের মঙ্গল আমাদেরই আহ্বান করতে হবে···বিপ্লবকে ষড়যন্ত্রকারীর চক্রান্ত বললে চলবে না···বহুদিনের সঞ্চিত বহু অন্যায় যখন সহ্যাতীত হয়ে পড়ে তখনই বিপ্লব জন্ম নেয়···চাই শ্রেণীসংগ্রাম···শ্রেণী-সংগ্রামকে উপেক্ষা করা রাষ্ট্রের চলবে না···

কিন্তু শান্তি কোথায়? একথা সত্যি। কৌস্তুভ এসব কাজে উন্মাদনা পায়···উন্মাদনার মুহূর্ত এত ক্ষণিক, এত চঞ্চল যে তাকে পেয়েও সুখ নেই···নেশার মত পেয়ে বসেচে কৌস্তুভকে···সপ্তাহের ছ'টা দিন অফিসের কাজে নিজের শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহটাকে মেসের বাড়ীতে টেনে এনে রাত্রির নিবিড়তার মাঝে এলিয়ে দেওয়া এবং চাকুরীজীবিদের বহু আকাঙ্ক্ষিত রবিবারটিকে রুমা দেবীর দরবারে হাজির হ'য়ে তাকে প্রসন্ন করা···সপ্তাহের ছ'টা দিন এই একটি দিনের জন্য

উন্মুখ হয়ে থাকে···নিজের নির্জন কক্ষে যখন মনো-বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচাই করতে বসে, তখন সময় সময় খালি ঘরেই হো হো করে হেসে ওঠে – আবার যখন ভাব প্রবণ হয়ে ওঠে, তখন যুক্তির অতীত এক অনাস্বাদিত রস-পিপাসায় অন্তর ব্যাকুল হয়ে ওঠে···

দৃশ্যান্তরে : দার্জিলিংএ একটি চতুর্দিকে কাঁচ পরিবেষ্টিত ঘরে এস্ক্রিটোয়ারে বসে লিখে যায়···সকাল থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত বসে বসে অনেক চিঠি লিখলে···প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি দার্জিলিং··· প্রকৃতির এই লীলানিকেতনে অকবিও কবি হয়ে ওঠে ···ধূসর পাহাড়ের বুক চিরে উষসির আলোর তরল স্পর্শে ঘুম ভাঙে এখানকার ভ্রমণকারীদের···ঘুম থেকে উঠে দেখে : কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফাবৃত চূড়োয় প্রভাতের সোনালী আলোর প্রতিফলিত রূপ···স্নিগ্ধ মাধুর্যে ভরে ওঠে মন···প্রভাতিক সঞ্চয় দিবসের কর্মে নববলের জোগান দেয়···

উৎসাহ ও শ্রীলতা এসে দু'খানা চৌকি টেনে বসে।

নীলা লেখা থেকে মুখ ফিরিয়ে মোড় ঘুরে বসে।

শ্রীলতাই কথা বলে প্রথমে : কেমন ঠাকুরঝি, দেখলে ত নবনীবাবুকে। এবার আর অমত করো না বাপু—

উৎসাহের চোখে মৌন সমর্থনের ইসারা।

নীলা মৃদু হেসে জবাব দেয়ঃ বিয়ে যে করতেই হবে এমন কি মানে আছে?

শ্রীলতা প্রতিবাদের সুরে বলে, মানে একটা আছে বৈকি! যে বয়সের যে কাজ…বয়োঃধর্মকে অস্বীকার করতে ত আর পারবে না…প্রকৃতিকে অস্বীকার করে যৌবনে যোগিনী সাজবে…এই বা কেমন কথা…

নীলা কথার মাঝে তরলতা মিশিয়ে জবাব দেয়ঃ এটা হলো মানুষের রুচির প্রশ্ন। যার ভাল লাগবে, তিনি বিয়ে করবেন…মানুষের ব্যক্তিগত রুচির উপর জুলুম করতে চাওয়া অন্যায়…

শ্রীলতা আত্মীয়তার সুরে ঘনিয়ে বসে বলেঃ তোমাদের সঙ্গে তর্কে পারবে কে? মেয়েমানুষের কি সকল সময় এক যায়…একটা দেখাশোনার লোকও ত চাই—

নীলা শ্লেষের সঙ্গে বলেঃ বৌদি, আজকের দিনেও যদি তোমরা "দেখাশোনা", "অবলম্বন" ইত্যাদি বুলি আওড়াও, তবে সত্যি ভারী দুঃখ হয়…আমাদের জাতটাকে আর স্বাবলম্বী হতে দেবে না দেখচি…এই জড়তা ঘুচবে কবে?

উৎসাহ এবার কথা বললেঃ নবনীকে না পছন্দ

হবার কারণ নেই···বিদেশে অনেকদিনই ছিল সে···কিন্তু পরীক্ষার মাপকাঠি আনেনি বলেই তাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না···য়ুনিভার্সিটি থেকে টেক্‌নিকাল কলেজ সব জায়গাতেই সে ঢুঁ মেরেচে···আর দিশি বিদেশী উভয় কালচারের সমন্বয়ে এক নোতুন কালচারের জন্ম দিয়েচে সে···আলাপ পরিচয়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেচ···রাজনীতি থেকে সাহিত্য ওর নখদর্পণে···ফাঁকি দেবার উপায় নেই···বিশেষ করে বাস্তব-জগতে বাঁচবার পক্ষে যে অর্থের সবচেয়ে প্রয়োজন, তা' ওর আছে···ধনকুবের বললেও অত্যুক্তি হয় না···

নীলা কি-একটা উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুতচ্ছিল, কিন্তু বাধা পেলে নবনীর আগমনে।

নবনী এসেই সবাইকে নমস্কার জানিয়ে ভূমিকা সুরু করে: কোথায় আপনারা দেখচি এখনও তৈরী হন্‌নি! জলা পাহাড় যাবেন, না সিঞ্চল লেকে যাবেন? কি ঠিক করলেন শেষ পর্যন্ত আপনারা।

উৎসাহ-ই উত্তর দিলে: তোমাদের বৌদির ত শরীর খারাপ করেচে। কাজেই আমাকে বাড়ী থাকতে হবে তোমার বৌদির পাহারায় ··

শ্রীলতা তর্জনী হেলে খেঁকিয়ে বললে: লজ্জা করে না বলতে, কত বৌদির জন্য দরদ! তুমি আর যাই কর

বাপু, বৌদির দোহাই দিও না···তোমার যেখানে খুসী তুমি যেতে পার আমি নিশ্চিন্তে একা থাকতে পারব···

উৎসাহ হেসে জবাব দেয়ঃ আমি বাসাতেই থাকব নবনী, তোমরা দুজনে বরং ঘুরে এস।

নীলা বলেঃ আজ তাহ'লে থাক না।

উৎসাহ বলেঃ সে কি হয়। নবনী এসেচে আর তোমার বৌদির দিন দিনই আরও বেশী শরীর খারাপ করবে···শেষ অবধি তোমাদের আর দেখাই ঘটে উঠবে না···

নীলা আর প্রতিবাদকে অগ্রসর হতে দিলে না। শীগ্ গীরই প্রস্তুত হয়ে নিলে। সাজলে মনের মত করে। আর্শিতে নিজের প্রতিফলিত দেহাবয়বের দিকে দৃষ্টিপাত করে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে স্থিরনেত্রে তাকিয়ে থাকে। স্বীয় প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে নিজেরই কেমন অহেতুক করুণার সৃষ্টি হলো···দীর্ঘসঞ্চিত সংযমের প্রতিদান স্বরূপ দেহের কাণায় কাণায় স্বাস্থ্যের যে প্রতীক তাই আজ যৌবন-উচ্ছলতার বিজয়বাণী সদম্ভে নোতুন করে ঘোষণা করলে···অনুভব করলে প্রকৃতির কাছে নারীর পরাজয়··· হায়! আজ যদি সে পুরুষ হতে পারতো···একটি সূক্ষ্ম অনুভূতির বিচিত্র প্রকাশ—যাকে শুধু অনুভবই করা চলে···

নবনী প্রথমটায় নীলার মেক-আপ্ দেখে হক-চকিয়ে যায়। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে অপলক নয়নে। নারী পুরুষের নিকট হতে প্রশংসমান দৃষ্টি চায় বটে, কিন্তু সে দৃষ্টির ভিতর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা থাকলে নিজেকে বড় বিব্রত বোধ করে। আত্মগোপনের জন্য : পরিচিত হলে আলোচনাকে বিষয়ান্তরে নিতে চায় : আর অপরিচিত হলে তীব্র উদাসীনতা সে-ব্যক্তির দৃষ্টি মোটেই আমল দিতে চায় না। নীলার সাজে অবশ্যি প্রথমটা কৌতুকই প্রচ্ছন্ন ছিল ; কিন্তু চাহনির গভীরতা যখন হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্যন্ত মোথিত করতে সুরু করলে তখন নীলা যেন অনেকটা ব্যস্ততার সঙ্গেই বললে, চলুন না—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

নবনী একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মনে মনে বলে, নারী তোমার ছলনা আমি বুঝি···তোমার কুহকে না জানি আমায় কত জ্বলে পুড়ে মরতে হয়···প্রকাশ্যে বললে : আমি ত প্রস্তুত হয়েই আছি···আপনি এগুলেই—চলাকে সচল করতে পারি···

শেষ অবধি সিঞ্চল লেকে যাওয়াই স্থির হ'লো।

দার্জিলিং শহর। পাহাড়ের পর পাহাড় ! শ্রেণীবদ্ধ পাইন বৃক্ষের মৃদু আন্দোলন, পাহাড়ী প্রাকৃতিক নগ্নতা, আর দিশি নাগরিক সভ্যতা—এই সব মিলে এক অপরূপ

আবহাওয়া। শীতের তীব্রতা টুরিষ্টদের পোষাকী প্রাচুর্যের কাছে লজ্জা পায়।

বহুলোকেরই সমাবেশ হয়েচে। ছোট ছোট দল এধারে ওধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নীলা আর নবনী, ত্বজনেই নির্বাক। কিন্তু ত্বজনেই বসে নেই। চলেচে যন্ত্রের মত। কথা তাদের মনে। সমুদ্রের ঝড়ের মত তার ব্যাপ্তি। মনে হয় ত্বজনেই একথা উপলব্ধি করচে। ত্বজনেই আছে পরম নিশ্চিন্তে। যেন উভয়েই উভয়ের পরম দোসর—একে অন্যের ব্যথার সাথী।

নবনী ভাবচে: জীবনে বোধহয় এমন শুভক্ষণ খুব কমই আসে। জনতার পাশ কাটিয়ে নীলাকে নিয়ে যখন এগিয়ে যায় তখন এক অব্যক্ত আনন্দে হৃদয় ভরে ওঠে। নীলার চোখের সামনে একটা খুব সাবাসী কাজ করে ফেলতে পারলে যেন মনে অনেকটা শান্তি পেত। আচ্ছা, কি করা যায়! আমি যদি পাখীর মত আকাশের বুকে এক চক্কর ঘুরে আবার নীলার পাশে এসে দাঁড়াতে পারতাম—তা'হলে কেমন হতো? নিশ্চয়ই নীলা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হোতো। কিন্তু তা' ত আর হবার নয়, সুতরাং এটি একটি উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আচ্ছা, এ পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে লাফিয়ে যেতে পারতাম—তা'হলে? এ তো শুধু কল্পনা। কিন্তু বিশ্লেষণ

করলে কি দাঁড়ায়? সেই প্রাচীন শিভ্যাল্‌রাস্ স্পিরিট··· যুক্তিবাদীর পরিপক্ক মনেও প্রথম যৌবনের কল্পনার সুর পুনরভিনয় করে—এই ভেবে অবাক হয়। নারী-পুরুষের আকর্ষণ যে শাশ্বত, চিরন্তন—এ কথাটাই বার বার মনে হয়। এ-তো গেল তত্ত্বের দিক; কিন্তু বাস্তবে কি করে প্রস্তাবনা পর্ব আরম্ভ করবে সেই চিন্তায় কিছুক্ষণ সময় চলে যায়। আত্ম-বিজ্ঞাপন কি করে দিতে হয় সে ফিকির না-জানা থাকলে বিংশ-শতাব্দীতে কোন কাজেই সফলকাম হওয়া যায় না। বিশেষ করে প্রেমের ব্যাপারে ত একেবারে অচল। একটা কথা মনে জাগে আত্ম-বিজ্ঞাপন না আত্ম-নিবেদন। দুটোই চাই। একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ।

নবনীর স্বভাবে প্রধান দোষ এইখানেই। বহু ভাষায় পারদর্শী। জগতের সকল তত্ত্বই তার করতলগত; কিন্তু প্রেমতত্ত্বের এই দুর্বলতা ভারতীয় সনাতনী ভাল ছেলের মজ্জাগত সংস্কার। মাঝে মাঝে নবনীর অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সকল সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারলেও আজ পর্যন্ত এই সামান্য সংস্কারকে এড়াতে পারে নি। মনের সঙ্গে অনেক আত্মিক যুদ্ধ করেছে। সে-যুদ্ধে জয়লাভ করলেও প্রকাশের ভীরুতা বাইরের সংস্কারকে পরিত্যাগ করতে সাহস দেয় নি।

এজন্য অন্তরে একটি গোপন লজ্জা এসে আশ্রয় নিয়েচে।

পৃথিবীতে বাঁচতে হলে প্রকৃতির আবেদনকে অস্বীকার করা চলে না। দেহ ও মনের পরস্পর নৈকট্য থাকলেও দেহের দাবী সবার আগে। মনকে উপোস রাখলে মন হয়ত কোন রকমে মানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু দেহের উপবাসে স্বাস্থ্যহানি। সভ্যতা অনুভূতির মৃত্যু ঘটায়, প্রকাশের দীনতা বাড়িয়ে তোলে, আসল মনকে আড়াল করবার জন্য যবনিকা টেনে দেয়।

নীলা ভাবচে: পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে কেন এই বিশৃঙ্খলা? মানুষের মন কেন এত চঞ্চল? মানুষের মন ত শুধু এককে নিয়ে সুখী নয়। একনিষ্ঠতা তবে কি সামাজিক জুলুম, সংস্কৃতির মাপকাঠি। একটি প্রিয়দর্শন যুবকের সঙ্গে একটি তরুণীর একত্র ভ্রমণে যে আনন্দ আছে তা'তে বিস্ময়ের কিছু নেই। মানুষের এই গোপন দুর্বলতা বা ভাব-বিলাসমূলক আবেদনের কেন কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই?

মানুষের জীবনে ভালবাসা বস্তুটি কি? মানুষের উত্থান-পতন, দুঃখ-বেদনা, জয়-পরাজয়ের ইতিহাস রচনায় ভালবাসা কেমন ওতপ্রোতভাবে কার্য করে সেকথা সকলের জানা থাকলেও তা'তে সামাজিক অনুমোদন নেই,

কেন ? একটি জীবন যা'র ভবিষ্যৎ পুষ্পিত হতে পারতো নানা রসে রঙে—বিকশিত করতে পারতো তার সৌরভ সামাজিক পটভূমিকায়—যে হতে পারতো সমাজের শীর্ষস্থানীয়—সে কেন ভূমিগর্ভে তা'র সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রোথিত করে নিশ্চল জড়বৎ হয়ে পড়ে ? এই অবৈধ হৃদয়াবেগকে সামাজিক মর্যাদাদানের জন্য সমাজনেতার কাছে আবেদন নয়—চাই এমনি একটা সামঞ্জস্য, এমনি একটি প্রতিবিধান যাতে করে সামাজিক দৃষ্টিতে অবৈধ হৃদয়াবেগ জন্মলাভ করতে না পারে। যেখানে বন্ধনের ভয় বেশী, যেখানে পর্দার ওঠানামা সীমাবদ্ধ, যেখানে বিধিনিষেধের কড়াকড়ি সেখানেই অবৈধ-জিনিষের জন্মভূমি।

মানুষের দুঃখ-দৈন্য দারিদ্র্য আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার সনাতনী লালসা। আধ্যাত্মিক ভারত একটি পথের ভিখিরির উচ্ছৃঙ্খল কাম-প্রবৃত্তিতে সামাজিক অনুমোদন দেয়, আবার যাদের সমাজের অবজ্ঞাত বা নিম্ন শ্রেণীর জাত বলে বর্ণিত হয়েচে—তারা সামাজিক মাপ-কাঠির আর্যপ্রয়োগ। কিন্তু ভদ্রসমাজ ধোপদুরস্ত, কেতাবী বিদ্যে আর শাস্ত্রের অকৃটোপাশে বাইরের খোলস জমকাল রাখে। ভিতরে তাদের যাই থাক, ওপর তাদের রমণীয়। কিন্তু কেন এই ছদ্মবেশ ? মানুষ আসলে নিজে

যা' তা' কেন গোপন করতে চায়? এই কি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য?

নীলা ও নবনী হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর এগিয়ে এসেচে। স্থানটি নির্জন। আশে পাশে নাম না জানা পাহাড়ী বৃক্ষের গুচ্ছ। উভয়েরই মনে মনে কথা কওয়া তাদের পথ চলাকে সজীব করে পথের ক্লান্তিকে ভুলিয়ে রেখেচে। দূরত্ব বোধ মোটেই খেয়াল করেনি।

হঠাৎ উভয়েই প্রসুপ্ত চিন্তাধারা থেকে চমকে ওঠে।

নিকটেরই একটি ঝোপের আড়ালে একটি পাহাড়ী যুবক একটি পাহাড়ী যুবতীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। চিত্রটির মধ্যে বস্তুত বিস্ময়ের কিছু নেই; কিন্তু এমনি নিরালা স্থানে নীলা যেন নোতুন করে নবনীর কাছে লজ্জা পেল।

নবনী ভাবলে অন্যরকম। তাই বলেই ফেললেঃ আজ তোমাকে সবচেয়ে ব্রাইট্ আর লাভ্‌লি দেখাচ্ছে নীলা—

নীলা মৃদু হেসে জবাব দিলেঃ সত্যি? কিন্তু চলুন এধারে আর নয়, এবারে ফেরা যাক্।

নবনী একটু সাহসের সুরে পূর্ব কথার জের টেনে বললেঃ মনে ছিল আশা ধরণীর এক কোণে রচিব···

নবনীর অর্দ্ধসমাপ্ত কথাকে দলিত করে ঝঙ্কৃত কণ্ঠে নীলা বলেঃ আর কাব্যি নয়, নবনীবাবু···এই

বাক্যচ্ছটার কুহকে পুরুষ নারীকে চিরদিন ভুলিয়ে এসেচে···কিন্তু আর নয়···

নবনী হতবুদ্ধির স্বরে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে ? কি আর নয় নীলা দেবী ? আমাকে একটু বুঝিয়ে বল··· অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনার আড়ালে যদি আশ্রয় নেও, তবে···

নীলা নবনীর অপরিসমাপ্ত কথার জের ধরে বলে : তবে বলি শুনুন। নারীর সৌন্দর্যকে দলিত করবার জন্যই যে পুরুষের জন্ম আমি তাকে করুণা করি। পুরুষ নারীকে চিরদিন ভুলিয়ে এসেচে। পুরুষেরই অত্যাচারে নারী সন্তান ধারণ করে, কুৎসিত হয়, সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে বাতিল পড়ে।

নবনী আহতভাবে বলে : শুধু কুৎসিত দিকটাই তোমার নজরে পড়ল আর পুরুষের এই বিরাট প্রেমের মহিমা অনুভব করলে না। পদ্ম পাঁকেই জন্মে, কুৎসিতের ভিতরই সুন্দরের জন্ম। এই যে পাহাড়ী যুবক-যুবতীর দৃশ্যটি দেখ্‌লে—তুমি কি লক্ষ্য করেচ তাদের চোখ-মুখের অপরিসীম পরিতৃপ্তি, গভীর তন্ময়তা, নিবিড় সুখানুভূতির অপরূপ বহিঃপ্রকাশ···

নীলা দৃপ্তস্বরে বলে : আপনি দেখচি ভদ্রতার সীমাকে অতিক্রম করতে চলেচেন ?

নবনী বলে ঃ তুমি ভুল বুঝেচ। আমাদের দেশে কবে সেই শুভদিন আসবে, যেদিন সরল মনে বিনা সংকোচে নারী ও পুরুষ সবচেয়ে অবজ্ঞাত, অথচ সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়টি আলোচনা করতে পারবে···

নীলা বলে, দেখুন, আলোচনায় সংকোচনশীলতা আমার কোনদিনই নেই—তবে উদাহরণের সাহায্যে যখন ব্যক্তিগত বিষয়ের অবতারণা করা হয় তখন একদেশদর্শিতা দোষ স্পর্শ করে···

আলোচনায় এইখানে একটু বাধা পড়ে। নবনীও আর বিশেষ কিছু কথা বলে না। উভয়েই নির্বাক।

মানুষের মনের ভিতরে যে কি আছে, কে জানে? এই মনের গভীর অন্ধকারে বহু জিনিষ লুকিয়ে থাকে, তারা তর্ক করে, যুক্তি হানে, ক্ষণে সেখানে ধ্বনিত হয় বিজয়ের বাণী, কখনও বা পরাজয়ের গ্লানি, আবার ক্ষণে ভীত, শঙ্কিত, অলীক ভয়ে পীড়িত···মানুষের ভয় মানুষকে নয়, বনের হিংস্র পশুকেও নয়, এমন কি সাম্রাজ্যবাদীকেও নয়—যত ভয় মানুষ করে তার নিজের মনকে···

রাত্রি গভীর। উঁচু নীচু পাহাড়ের গায়ে পথের বৈদ্যুতিক আলো আকাশের ক্ষুদে ক্ষুদে তারার মত

মিট্‌মিট্‌ করচে। জানলার কাচের সার্শির ভিতর দিয়ে দেখা যায়।

শীতের তীব্রতা বিছানার মায়াকে বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু নীলার চোখে ঘুম নেই। হাতের অর্ধসমাপ্ত বইটিকে সরিয়ে রেখে ঘুমোবার চেষ্টা করে। মাথায় শুধু গিজ্‌গিজ্‌ করচে একরাশ চিন্তার বোঝা—কি করলে কি হয়? এটা কেন হয়? ওটা কেন নয়? মানুষের জীবনের একটি অর্থ আছে—তা' হচ্চে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ···সব মানুষ কি পেরেচে তার ইচ্ছেকে, তার কল্পনাকে পরিপূর্ণতার রূপ দিতে? জীবনে ব্যর্থতাই ত বেশীর ভাগ লোকের বিধিনির্দিষ্ট উপহার···কিন্তু ব্যর্থতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম নেই কেন? মানুষকে বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে। এই মহান্ ব্রতে উদ্‌বুদ্ধ করবার অনুপ্রেরণা দিতে হবে···

মানুষের চিন্তা যেমন অতর্কিতে মগজে এসে ভিড় করে, ঘুমও তেমনি বিনা নোটিশে আসে। ঘুম আছে বলেই মানুষ বেঁচে আছে, অথচ ঘুম মৃত্যুরই রূপান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। শোক, দুঃখ, বিচ্ছেদ-বেদনা, অভাব-অভিযোগ, মান সম্মান, ঐশ্বর্য, ধনী ও নির্ধনের পার্থক্য সবকিছু ভুলিয়ে দেয় ঘুম। একটানা সুখের ভিতরেও বৈচিত্র্য আনে ঘুম। জীবনে অন্ত পাঁচটি

জিনিষের মত ঘুমের প্রয়োজনও মানুষের জীবনে অবশ্যম্ভাবী।

ছন্নছাড়া চিন্তা করতে করতে নীলার এক সময় ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। উঠে দেখে পূবের আকাশ সোণালী রোদে ছড়িয়ে গেছে। দার্জিলিংএ আসা অবধি এমনভাবে সূর্যদেবকে আত্মপ্রকাশ করতে কখনও দেখেনি। কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফাবৃত শৃঙ্গে সূর্যকিরণের অনধিকার প্রবেশ গিরি-কন্যার অসহ্ত বেশ-বাস আত্মগোপন করবার পথ দেয় নি! নগ্নতা রসোতীর্ণ সৌন্দর্যে ব্যাঘাত জন্মায় নি—মাধুর্য বাড়িয়েই দিয়েচে। প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলা-নিকেতনে সৌন্দর্যকে এমনিভাবে সযত্নে রক্ষা করতে দেখে মনে হয় যদি সবকিছু এমনি হোত। প্রকৃতি কখনও সৌন্দর্যকে দেখতে পারে না—সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রকৃতির চিরবৈরিতা—সৌন্দর্যকে ধ্বংস করাই প্রকৃতির একমাত্র লক্ষ্য।

পাশের বাড়ীর গিন্নীটি ব্যস্ততার সঙ্গে ছুটোছুটি করচেন। বাড়ীটি ঠিক নীলাদের বাড়ীর নীচে একটি বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের ওপরে। ইস্কুল অফিসের সময় হয়ে এল প্রায়। গিন্নীটির চলনের ভাবভঙ্গিতে গৃহিণীপণার মাধুর্য গৃহের আনাচে কানাচে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দেখে মনে হয় এ-উদ্দীপনার স্বতন্ত্র উৎস যেন কোথায় লুকিয়ে আছে!

এত উৎসাহ কোথায় পায় এরা ! এত বড় বৃহৎ পৃথিবীর দিকে ভ্রূকুটি হেনে গৃহের সংকীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে প্রাধান্যের বিজয়পতাকা উড়িয়ে উচ্ছ্বল খুসীর প্রাচুর্য আর ধরে না কেন? গৃহের চারি প্রাচীর নিয়েই কি মেয়েমানুষের সাধনা ও সিদ্ধির শেষ সীমা রেখা ?

দূরের নীলাভ আকাশ, প্রকৃতির অপরূপ বৈচিত্র্য, বিশ্বের সার্বজনীন আবেদন—সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নারী কেন পুরুষের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আধাররূপে ক্ষুদ্র গৃহপ্রাচীরের অন্তরালে স্বীয় সত্বাকে বিসর্জন দিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করে না ! এ কোন্ যাদুমন্ত্র বা স্বৈরাচারের অদ্ভুত কৌশল, যার বলে পুরুষের এই একচ্ছত্র আধিপত্য ! এ কি মাতৃত্বের দুর্জয় লোভ, না যে অবরুদ্ধ কামনা অন্তরে প্রলয়ের সৃষ্টি করে, অথচ প্রকাশের মোহনা যার লোকাচারের কষ্টিপাথর দৌর্দণ্ড প্রতাপে পথ আগলে বসে আছে তারই একনিষ্ঠ স্বাধীনতা···যদি ধরা যায় নারীর এই বৈশ্যতা প্রবৃত্তির উন্মত্ততা চরিতার্থের সামাজিক পাসপোর্টের একটি সুষ্ঠু বহিঃপ্রকাশ···তবে তার চাইতে আর দুঃখের কি আছে ! ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের স্বপ্নের সাংকেতিকতাই যদি সমাজনেতার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হয়ে থাকে তাহলেও বোধ হয় শতকরা নিরানব্বুই জন নারীই দৃষ্টির গভীরতাকে সংকীর্ণ করে ভোগের পঙ্কিল পিচ্ছল পথের

দিকেই আকর্ষণ বেশী···স্থূল আনন্দের মোহপাশ কাটিয়ে নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতাকে আমন্ত্রণ করে নারী যখন শুচিতার উচ্চ শিখরে উঠ্‌তে পারবে, তখনই নারী পাবে তার মুক্তির পথ···ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কথা নয়···আসল কথা ক্ষুদ্র-গৃহাবেষ্টনী হতে মুক্ত হয়ে নারীকে বিশ্বের সুরে সুর মেলানর অভিযান•••নারী শুধু গৃহের খেলার পুতুল নয়··· বিশ্বের দরবারে নারীর কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে,—তা শুধু মৌখিক নয়, অন্তরের কবরী রচনায় তার স্থান···

পাশের বাড়ীর গিন্নীটি দুপুরে বেড়াতে এল নীলাদের বাড়ীতে। পরিচয়ে জানা গেল তারই সমবয়েসী। মহিলাটি প্রশ্ন করলেন : আজ সকালে তুমি ভাই এত তন্ময় হয়ে কি দেখছিলে···

নীলা হেঁয়ালি করে জবাব দিলে : দেখছিলুম বিশ্ব-দরবারে তোমার স্থান কোথায় ?

মহিলাটি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে বললেন : তোমার দেখচি ভাবনার গাছ-পাথর নেই। তা' আমাকে কোথায় স্থান দিলে ?

নীলা হেসে বললে : সতী-সাধ্বী দেশের লোক—তোমাদের বাস গোলোকধামে—তোমাদের নাগাল কি কেউ পায় ?

মহিলাটি বললেন : তোমার কথা ঠিক বুঝবো

না। যেজন্য এসেচি সেকথাই শুধোন হয়নি, তোমার বৌদির কি ছেলে হ'লো, না মেয়ে? কোথায় আছেন এখন?

নীলা একনিঃশ্বাসে বললে: ছেলে হয়েচে। ভালই আছেন। হিল-টপ্ নার্সিং হোমে আছেন।

মহিলাটি ইঙ্গিতমিশ্রিত কৌতুক হাসি দিয়ে বললেন: মেয়েমানুষের এই যে জীবনমরণ সমস্যা এর তুলনা নেই, ভাই—

নীলা বললে: এতে আর নোতুনত্ব কি? প্রকৃতির নিয়ম, এ হবেই ত।

মহিলাটি বললে: দূর আমি কি তাই বলচি! নারীর এই সমস্যায় পুরুষ কতটুকু দায়িত্ব নিলে?

নীলা বললে: সমস্যার সুরুতে যার অভিযোগ নেই, সমস্যার শেষে তার অভিযোগ করলে চলবে কেন?

মহিলাটি উচ্ছল হাসির দীপ্ত ভঙ্গিতে বললে: অভিযোগ আছে কি নেই, সে তুমি বুঝবে কি? তুমি ত আর ঘর করলে না?

নীলা বললে: কি জানি, ঘর করলেও অভিযোগ করতুম না। নিজেকেই ঠিক পথে চালাতে চেষ্টা করতুম।

মহিলাটি অনেকটা মুরুব্বিয়ানা সুরে বললে:

আমরাই কি আর করি না ভাই, কিন্তু রক্তের তালে তালে যখন ছন্দের নানা রঙ্ তোমায় অভিভূত করে ফেলবে—তখন তুমি তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ ভুলে গিয়ে আত্মসমর্পন করে জীবনের সত্য দর্শন খুঁজে পাবে···

—তবে তুমি নালিশ করচ কেন? জীবনের সত্যকে ত তুমি খুঁজে পেয়েচ।

—পেয়েচি বৈ কি ভাই···শুধু পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েচি তোমার মনকে···

নীলা বেশ সংকুচিত ভাবেই জবাব দেয়ঃ আমার মনকে পরীক্ষা করবার তোমার এ অনাবশ্যক কৌতূহলে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হচ্চি···

—চোখের ওপর দুটো মাস আজ ক্রমাগত তোমায় দেখে আসচি—তোমার সম্বন্ধে কৌতূহল না হওয়াটাই ত অস্বাভাবিক···আজ যাই ভাই, ছেলেমেয়েরা এক্ষুনি ইস্কুল থেকে ফিরে আসবে···আরেক দিন আসব'খন···

নীলা ঘড়ির দিকে চারটে বাজতে দেখে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। রুমাদি সঞ্জয় নামে একটি ছেলেকে পাঠাচ্চেন মাত্র সাতদিনের জন্য। নীলার উপর ভার পড়েচে এই সাতদিন সঞ্জয়কে একটি নিভৃত স্থানে লুকিয়ে রাখবার। সবশেষে রুমাদি লিখেচেনঃ কৌস্তুভ এত আত্মভোলা যে প্রেস আইন বাঁচিয়ে লিখতে জানে না। একটি বিশেষ

প্রবন্ধের জন্য কৌস্তুভকে বেশ মুস্কিলেই পড়তে হোতো যদি না আমার সঙ্গে দৈবাৎ প্রেস-অফিসারের পূর্ব পরিচয় থাকতো। বিলেতে একই ল্যাণ্ড-লেডির বাড়ীতে একসঙ্গে থাকবারজন্য এবারে কৌস্তুভের ভাগ্যে মাপ পাওয়া সম্ভবপর হোলো।

নীলা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। এত আত্মভোলা বলেই ত এত আত্মসচেতনা। যে পুরুষমানুষ নিজকে ভুলতে পারে না তাকে সব মেয়েই ভুলে যায়। পুরুষের আকর্ষণ তার ধ্যান-গম্ভীর প্রশান্তি।

এই যে সঞ্জয়, এখানে। বাঃ, কি সুন্দর ফুটফুটে চেহারা! এই কচি ছেলেটিকে মাতৃপূজায় আহুতি দিতে কেন রুমাদি আহ্বান করলেন! দেশ মাতৃকার পূজায় নিষ্কলঙ্ক শিশুর অঞ্জলি মা গ্রহণ করবেন, তাই কি?

কি, ওই একটি বেডিং…বেশ চল…উঁচুতে উঠচে ক্রমশ…স্টেপ্ এসাইডে নবনীর বাড়ী। সেখানে সঞ্জয় থাকবে। ব্যাপারটা আগেই ঠিক হয়ে আছে।

নবনী বাড়ীতেই ছিল। নীলার নমিনি বলে অভ্যর্থনা একটু অতিরিক্তই পেল।

বিশ্রাম করবার পর সঞ্জয় বললে: এমন নরম বিছানা আর এমন মুখরোচক খাবার আবার অনেকদিন বাদে ভাগ্যে জুটলো নীলাদি…

উত্তরে নীলা একটু হাসলে। প্রশ্ন করবার নিয়ম নেই। কতদিন এই ছেলেটি পথে পথে এমনিভাবে ঘুরে বেড়াচ্চে, কে জানে? কোন্ প্রেরণায় এ তরুণ আজ গৃহহীন—তার খোঁজ কি কেউ রাখে? অতীতের ব্যবস্থা ছেলেটির মনে ধরে না···চিত্ত চাঞ্চল্যের দোলায় সে অস্থির···তাই আজ গৃহহীন···

ছেলেটির সুখ-সুবিধের দিকে নজর দিয়ে নবনী নীলার হৃদয়ের স্নেহ-স্পর্শাতুর কোণটি দখল করে নিলে। নবনীর হৃদয় আছে, একথা নীলা আজ যেন সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলে। নবনীও দিনের পর দিন সঞ্জয়ের পরিচর্যায় আরও গভীরভাবে মনোযোগ দিলে। নবনীর কাছে নীলা এখন গৌণ, সঞ্জয়ই সব।

সাতদিনের পাঁচটি দিন অতিক্রান্ত হয়েচে। আর মাঝে মাত্র তুটো দিন বাকী। সকালে বিকালে তু'বেলাতেই নীলা খোঁজ নিয়ে যায়। গল্পগুজবে সময়টাকে হালকা ভাবে কাটিয়ে দেয়।

সঞ্জয়ের সর্বশরীর ক্লান্তিতে ভরা। সেই যে প্রথম দিন এসে বিছানা নিয়েচে তা'কে আর ছাড়েনি। সঞ্জয়ের এভাবে বিছানা নিয়ে পড়ে থাকা নবনীর প্রথমে ভাল লাগে নি। সবই সহ্য করেচে সঞ্জয়ের কিশোর মুখের

সারল্যকে লক্ষ্য করে—আর পিছনে আছে নীলার মৌন আবেদন।

সঞ্জয় পালিয়েচে। ওর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে নবনীর পঁচিশ পাউণ্ড দামের ছুটি স্যুট্ ও নগদ পাঁচশ টাকাও নেই! নবনীর দুঃখ, চুরি করে কেন পালালো চোরের মত চুপি চুপি। চাইলেই ত অনায়াসে দিতে পারতো।

নীলা বলে, চুরি বলে ওকে অপমান করো না। ব্যক্তিগত সুখের জন্য ও কিছু নেয়নি। যা' কিছু করেচে সবই প্রয়োজনের তাগিদে, দেশের খাতিরে।

নবনী এই সহজ কথাটা কিছুতেই বুঝ্তে পারে না। দেশের বিরাট কাজে যিনি জীবনোৎসর্গ করবেন, তাঁর মনোবৃত্তি কেন এত ছোট হবে!

নীলা বলে, কারণ অতি স্পষ্ট। তোমরা যাঁরা দিতে পার তাদের কাছে চাইলেও পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে তোমাদের কাছে জুলুম করতে চাইলে বিড়ম্বিতই হতে হবে।

নবনী বলেঃ কিন্তু সব মানুষ একই ধাতুতে গঠিত নয়।

নীলা বলে: ভাত সিদ্ধ হ'লো কি না তা' একটি ভাত টিপেই সমস্ত হাঁড়ির ভাত ঠিক করা হয়। তেমনি আমাদের দেশের বড়লোকদেরও।

নবনী এ উদাহরণ মানতে চায় না—কারণ কথাটা সত্যি হলেও সত্যি নয়। যাদের প্রাণ আছে, যাদের দেবার মন আছে তাদের সব সময় সুযোগ দেওয়া হয় না। কিন্তু কেন এই অবিচার? বড়লোকদের যদি এ অভিমানটুকু থাকেই, তা'তে এমন দোষের কি আছে! আমার টাকা আছে বলেই আমি অস্পৃশ্য এ কখনও হতে পারে না। সত্যিকারের প্রাণের দরদটুকু অনুভব না করলেই বা চলে কি করে? যেহেতু তুমি ধনী সেই হেতু তোমার দেশের দরিদ্র ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ জন্মাল—এই কি যুক্তি?

* * * *

নীলা দাদার কাছে আর্জি পেশ করলে কোলকাতায় ফিরে যাবার। বৌদি বিপদ এড়িয়ে সুস্থ হতে চলেচেন। ওর নিজেরও কলেজ ক'দিন কামাই হলো। আর ছুটী নিতে চায় না! সবে পার্মানেণ্ট হয়েচে। একটা খারাপ ধারণা না জন্মায় প্রিন্সিপালের।

দাদা উত্তর দিলেন: দেড়শ টাকা মাইনের চাকরীতে

আর প্রয়োজন নেই। চাকরী করে কে কবে বড়লোক হয়েচে। আমার সঙ্গে দেশে চল। খাও-দাও মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াও। দেশের কাজ করতে চাও, কর; কিন্তু আর চাকরী নয়।

নীলা ওজর আপত্তি অনেক দেখাল। শেষ অবধি চুপিচুপি ডাক্তারী সার্টিফিকেট দিয়ে ছ'মাসের বিনা বেতনে ছুটী নিলে। অর্থ, আখেরে চাকরীটি যাতে বজায় থাকে।

দাদা পরিস্কার করেই বলে দিলেনঃ সম্পত্তিতে আমার যেমনি অংশ আছে, তোমারও আছে। চাকরীর দুর্ভাবনা তুমি ছেড়ে দাও। আমার একটা আইডিয়া আছে, সেই আইডিয়াকে রূপ দিতে চাই। শিক্ষাদান করা জীবনের একটি মহৎ কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু শহরের জন কয়েক ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েকে কলেজী শিক্ষা দিয়ে দেশের ও দশের মহৎ উপকার করলে বলে মনে মনে গর্ব অনুভব করবে, তা আমি চাইনে। অজ্ঞতা আর মূর্খতাকে দূর করতে হবে গ্রাম থেকে সাধারণকে শিক্ষা দিয়ে।

নীলা জবাব দেয়ঃ কথাগুলোতে খুবই রোমাঞ্চ আছে, কিন্তু মন কি এত অল্প নিয়ে তৃপ্ত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ, শেলী, কীটস্ হজম করে বর্ণ-পরিচয়

আর প্রাথমিক পাটিগণিত নিয়ে দিনের পর দিন কাটাব ?

উৎসাহ বলে ঃ এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কলেজও একই কবিতা বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়িয়ে একই দিনে জোর করে নানান্ ঢঙে মেয়েদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হাসচ—তখন তোমার রোমাঞ্চ থাকে কোথায় ?

নীলা বলে ঃ সুন্দর চিরকালই সুন্দর। কৃত্রিম হলেও সুন্দর, সুন্দর।

উৎসাহ বলে ঃ ওসব নাটক-নভেলী কথা, বাস্তবে অচল। সত্যি সত্যি যদি তোমার দেশের কাজে প্রাণের টান থাকে, তবে তুমি আমার কথা মানবে। এক-ঘেঁয়েমিকে দূর করতে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক ঘুরে আসবে, তাহ'লে মনে নূতন বল পাবে।

* * * *

ঝড় এল। দূরের আলো স্তিমিত প্রায়। ঈশান কোণে মেঘ উঠেচে—রাঙা মেঘ—তারপর যতদূর চোখ যায় শুধু মেঘ—রং তাদের নিকষ কালো। বাতাস চলেচে বেগে ভেসে। দেখতে দেখতে ছাপিয়ে পড়ল দিকবিদিক। হাহাকার উঠল দিগদিগন্তে। বিশ্ব কেঁদে উঠল, কোথায় আলো ? বাতাস বইল ধীরে ধীরে, রী রী

করে পাতায় পাতায় শিহরণ জাগিয়ে বিস্মিত বনানীকে দিয়ে গেল জাগিয়ে। বায়ুবেগ বেড়ে চলে। বিদ্যুৎ হেনে ঝড় এল। বিশ্ব ভাবে : এমন কেন হয়? সৃষ্টির ধ্বংসে কেন এমন উল্লাস—হে ভৈরব, হে রুদ্র! পুঞ্জীভূত মেঘের কোলে তোমার দামামা বেজে উঠল কেন? কার বিরুদ্ধে তোমার এ উদ্দাম অভিযান! সৃজন ক্ষেত্রে চললো ধ্বংসের লীলা···

দমকা বাতাস নীলার ঘরে প্রবেশ করে বিস্রস্ত করে তুললে তার কুন্তলরাশি। জানলার পাশে সে উঠে আসে। দেখতে পেলে দূরে যুগ যুগ ধরে সযত্নে পালিত বৃক্ষকে ছিনিয়ে নিয়ে চলেচে পৃথিবীর বুক থেকে নূতনের জন্য বিস্তীর্ণ-স্থান করে। নীলা ভাবচে : তার মনের কোণে কি দোলা দিয়ে গেল এ-খেলা···ক'দিন হ'লো তারও মনে চলেচে ঝড়। এ-ঝড়ে বোধকরি জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এক ফুৎকারে উড়ে যাবে···সে শিউরে ওঠে···জীবনের গত অধ্যায় আবার নোতুন করে বিচার করতে বসে···

নবনী সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল নীলার ঘরের কাছে। বললে : আসতে পারি।

স্বপ্ন থেকে চমকে উঠে নীলা বলে : এসো।

নবনী একটি চেয়ার টেনে জানালার পাশেই বসে।

বাইরের ঝড়ো আবহাওয়ার দিকে তাকিয়ে নবনী বলে: কি ভীষণ ঝড় দেখেছ। বেড়াতে বেরুতে পারব না, রেডিও চালাতে পারব না, কোন কাজে মন দিতে পারব না। সত্যি এই নিরলস মুহূর্তগুলো কাটান এত কষ্টকর।

নীলা সংক্ষেপে বলে: কেন? দাদা কোথায়?

নবনী বলে: সেই যে বেলা তিনটের সময় বাইরে গেচেন এখন অবধি দেখা নেই। কটা হবে এখন?

নীলা বলে: তা প্রায় সাড়ে ছ'টা হবে। বৌদিও নেই—অবাধ স্বাধীনতা, অখণ্ড অবসর।

নবনী বলে: সত্যি, আমি ত ভেবে পাই নে ভদ্রলোক এত খাটতেও পারেন। কাজে কখনও বিতৃষ্ণা দেখলাম না। সময় সময় ভাবি: উৎসাহবাবু এইসব লোকদের প্রশ্রয় দিয়ে তাদের দুঃখ-বেদনাকে আরও বাড়িয়ে তুলচেন।

নীলা বলে: তিনিও ত তাই চান।

নবনী বলে: কি রকম? কথাটা আমার ঠিক বলা হয়নি। অর্থাৎ যে-অভাব-বোধ লোকটির সাতপুরুষে কোনদিন অনুভব করেনি, তাকেই জাগিয়ে দিলে লোকটির মানসিক শান্তির বিপর্যয় ঘটবে।

নীলা বলে: সমস্যা বের হলে তার সমাধান করবার

একটা প্রবৃত্তি জন্মাবে। স্রষ্টারও তাই দেখে হবে প্রকৃত আনন্দ।

নবনী বলে: জাতির উন্নতি সম্প্রসারণে আপাতঃ-দৃষ্টিতে ভালই দেখাবে বটে কিন্তু পূর্বের সারল্যকে পঙ্গু করে জটিল মনোবৃত্তির আশ্রয় নিবে। জাতি বিলাসী হয়ে পড়বে।

নীলা বলে: সাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা ও নিজের নিজের বাঁচবার স্বাচ্ছন্দ্যটুকু যাতে করে অর্থনৈতিক শুভ্র স্তরে পৌঁছুতে পারে তারই উপলব্ধি বোধে বিলাসিতা কোথায়?

নবনী একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করছিল; কিন্তু উত্তর দেওয়া আর ঘটে ওঠে না। উৎসাহ ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে ফিরে এসেচে। মাথা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়চে, জামা-কাপড় সবই ভিজে গেছে।

শীগ্‌গিরই জামা কাপড় পরিবর্তন করে এক কাপ গরম চা খেতে খেতে নীলা ও নবনীর কৌতূহল মিশ্রিত প্রশ্নের জবাব দিতে বসে।

তিনটের সময় যখন বের হই, তখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা। প্রজাদের কাছে ব্যাপার শুনে ঝড় ঝাপ্‌টাকে উপেক্ষা করেই রওনা হ'লাম। পাঠানপাড়া আর ভরতখালি ছুটো পাশাপাশি গাঁ। পাঠানপাড়ার অনেক

প্রজা ভরতখালিতেও জমি রাখে ; কাজেই বস্তুত পক্ষে আমারও প্রজা। পাঠানপাড়ায় অবশ্যি আমার কোন জমিদারী নেই। কিন্তু তারা আপদে-বিপদে আমাকে মুরুব্বি ভেবে যখন আবেদন জানায় তখন আর উপেক্ষা করতে পারি না।

পাঠানপাড়ার জমিদারী সম্প্রতি সেস্ আইনে এ্যাটাচড্ হয়েচে। প্রজাদের ওপর অত্যাচার উৎপীড়নের সীমা নেই। যার তার উপর সার্টিফিকেট জারী করে পাওনার অতিরিক্ত আদায় করে, আদায়কারী মহাশয় তার পদমর্যাদার গৌরব বৃদ্ধি করেচেন। দুস্থ প্রজার করুণ ক্লেশের কাহিনী ওপরওয়ালার চোখে পড়ে না। আদায়-কারীর সরকারী অংকের স্ফীতি যেমনি দেখাতে হয়, তেমনি নিজের ব্যক্তিগত তহবিল গুছোবারও একটা প্রকাণ্ড সুযোগ। অল্পপ্রাণ তহশীলদার আপন ক্ষমতা গর্বে স্বেচ্ছাচারের রথ দ্রুত চালিয়ে দেন নিরীহ প্রজার ওপর। ফলে প্রজাদের দুরবস্থা একেবারে চরমে গিয়ে পৌঁছয়।

নবনী বললে : প্রজারা চুপ করে থাকে কেন? নালিশ করলেই ত পারে?

উৎসাহ একটু হেসে বলে : নালিশ করবারও একটা বিদ্যে থাকা চাই—সেটুকু থেকেও বঞ্চিত এরা। গ্রামে

বিশেষ থাকনি, কাজেই প্রজাদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তেমন ওয়াকিবহাল নও, এরা যে কত অসহায় তা না দেখলে বুঝতে পারবে না।

তারপর শোন যা' বলছিলাম: সার্টিফিকেট ফাইল করবার একটা নিয়ম আছে, যেমন প্রত্যেক মৌজায় এমন প্রতিপত্তিশালী দু' একজন লোকের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট ফাইল করতে হয় যাতে করে মৌজার অন্যান্য সকলে সেই ভয়ে ভীত হয়ে আপোষে খাজনা পত্র মিটিয়ে দিয়ে যায়। সেই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদিকে বিচার করতে হবে এইভাবে যে তাদের দেবার সামর্থ আছে অথচ তারা দিচ্ছে না—নানা ছুতো করে বা ওজর আপত্তি দেখিয়ে। তারা হচ্ছে গ্রামের দৃষ্টান্ত স্থানীয়। তারা দিলে সবাই দেবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটেচে কি রকম একটু মন দিয়ে শোন। এক এক মৌজায় সার্টিফিকেট ফাইলিং হয়েচে ২৫০-শ'র কম নয়। তার মানে একরকম প্রায় সকলের উপরেই, কাজেই জুলুমেরও শেষ নেই।

সেক্রন্ সেভেন্ জারীর সঙ্গে সঙ্গেই থারটিন্ পি, ডি, আর এ্যাক্টও ইস্যু হচ্চে। প্রজারা মালপত্র হারাবার ভয়ে হাল চাষ দিচ্চে শুক্লপক্ষে রাত বারোটার পরে, আবার ভোর না হতে হতেই গরু-বাছুর লাঙ্গল সরিয়ে

ফেলে ভিন্ গাঁয়ে। বাড়ী-ঘর ছেড়ে তারাও অনেকে এদিক ওদিক আত্মীয় স্বজনের বাড়ী চলে গেছে। চাষীর নোতুন আবাদ উঠলে কয়েকটা দিন খুব স্ফূর্তিতে কেটে যায়। যদিও আগামীতে কি করে তার দিন কাটবে সে-ভাবনা তার নেই। জমির খাজনা, মহাজনের পাওনা, তহশীলদারের বায়না মিটিয়ে যা তার ভাগ্যে জুটে সে অতি সামান্য। তা দিয়ে আর বছরের বাকী সময়টা মেরুদণ্ড সোজা রাখবার মত অবস্থা থাকে না। ভাগ্যকে মেনে নিয়ে বিড়ম্বিত জীবন কাটাতে তারা অভ্যস্ত।

নবনী বলে ঃ এ ত ভারতীয় অর্থনীতির গোড়ার কথা।

উৎসাহ বলে ঃ পুঁথি-পুস্তকে সবই মিলবে। বাস্তবের সংস্পর্শে এসে পুঁথির সত্য যখন অক্ষরে অক্ষরে মিলবে তখন আপনা হতেই বুঝতে পারবে আসল গোলমালটা কোথায়? বকেয়া খাজনা চিরকালই বকেয়া থেকে যায়··· অতি কষ্টে বাৎসরিক সালিয়ানা তলবের একটি বছর পরিশোধ করতে পারলেই তার পক্ষে যথেষ্ট, তা-ই অবস্থা গুণে প্রায় সময় ঘটে ওঠে না।

নবনী বলে ঃ আমার কি মনে হয় জানেন ঃ আপনি যে স্কীম্ করেচেন তা'তে শুধু এদের প্রশ্রয় দেওয়াই হচ্ছে।

উৎসাহ বলে ঃ কি রকম ?

নবনী বলে ঃ দেখুন খাবার সংস্থান নেই। খাজনাপত্র দিতে পারে না, অন্য কোন সদুপায়ে রোজগারেরও আর দ্বিতীয় পথ নেই তবু ছেলেপুলে ঠিক নিয়মিত হারে জন্মাচ্ছে। আমার ত মনে হয় যতদিন না এর একটা কিছু প্রতিবিধান হয়, ততদিন আমাদের জাতের মঙ্গল নেই। গোড়ায় গলদ ঠিক এইখানটাতে। একটি ছেলে হলে তাকে ভাল খেতে পরতে দিতে হবে, বাঁচবার উপযোগী করে তুলতে হবে—সে চিন্তা আগে থেকেই করতে হবে।

উৎসাহ বলে ঃ তোমার কথায় যুক্তি থাকলেও কথাটা বড্ড স্থূল। মানুষের যেমনি খাওয়া-পরা দরকার তেমনি ছেলেপুলে হওয়াও একটা প্রাথমিক চাহিদা। একে তুমি উপেক্ষা করতে পারবে না। জীবনকে সহজ, সুন্দর ও মহিমান্বিত করে তুলতে প্রথমতঃ প্রাথমিক চাহিদাকে মিটিয়ে, তারপর এইসব গুণাগুণ যুক্ত করলে তবেই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ সুগম হবে। উদরে বুবুক্ষা নিয়ে পোষাকী প্রেম যেমন বাতুলতা বলে মনে হয়, তেমন চিরন্তনী মানব প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ করলে মনুষ্যত্বের দিকে এগিয়ে যেতে বাধা ঘটবে। যাক্ গে এ-সম্বন্ধে আমি এখন কিছু বেশী বলতে বা করতে নারাজ।

পাহাড়ী সর্দার এসে বলে ঃ য়্যাটাচের তহশীলদারবাবু প্রথমে পিনাকী বোষ্টমীর বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট করেন। হুজুর জানেন ত পিনাকীর সম্পত্তির মধ্যে একবিঘে জমি, একটি দুধাল গরু ও পিনাকীর সোমত্ত মেয়ে টিয়া। তাদের ভরণ-পোষণ চলে সাঁঝ-বেলার হাটে ওই গরুটির এক সের তিন পো দুধ বিক্রী করে। জমিতে ধান আবাদ করে আঁধিতে যা পায় তা' অতি নগণ্য, কিছুই হয় না। পিনাকীর অবস্থা দেখে গ্রামের সবাই আমরা আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করি। তহশীলদারবাবু যখন অস্থাবর নিয়ে পিনাকীর বাড়ী এলো, তখন গ্রামের সবাই ছোট বড় গিয়ে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে; কিন্তু কিছুতেই মন গলে না বাবু। গ্রেপ্তারি পরয়াণা (এ, ডাবলিউ) নিয়ে এসেচে, পিনাকীকে নাকি গ্রেপ্তার করবে। কথা শুনে আমরা হকচকিয়ে যাই। পিনাকী ও টিয়া তহশীলদারবাবুর দু' পা চোখের জল দিয়ে ধুয়ে দিলে। তবুও মানুষের পাষাণ প্রাণ গলে না। পিনাকীকে যেতেই হবে। পিনাকীর মেয়ে টিয়া বলে ঃ মা'কে নিলে আমাকেও নিতে হবে। শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। সে আজ সাতদিন আগেকার কথা। আজো আমরা টিয়া ও পিনাকীর কোন খবরই পাইনি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তবে আজ এতদিন পরে এসেচ কেন?

উত্তরে বললে : আসবার কারণ ঘটেচে হুজুর। আমরা গুছিয়ে কথা বলতে জানি না। হাকিম বাহাদুর আজ ভোরে ভরতখালি বাংলোতে এসেচেন। আপনি দয়া করে হাকিমবাবুকে বুঝিয়ে সব কথা বলে পিনাকী ও তার মেয়েকে উদ্ধার করুন। হাকিমবাবু বোধহয় কাল খুব সকালে উঠেই চলে যাবেন।

একথা শুনে দুর্যোগ মাথায় করেই ছুট দিলাম ভরতখালি ডাক-বাংলোর দিকে। দেখা করে আবেদন জানালাম। পরিচয়ে জানা গেল হাকিমবাবু আমার বছর চারেকের জুনিয়র, আমাকে নামে চেনেন প্রেসিডেন্সীতে পড়বার সময় থেকে। বিশেষ করে আমার নামে আছে কলেজ ম্যাগাজিনের এডিটারিতে।

বিশ্বাস মহাশয়কে আমার বক্তব্য বিশ্বাস করতে বললাম। তিনি আশ্বাস দিলেন। তারপরেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম : মহাশয়ের ডিস্‌ট্রিক্ট্ গেজেটিয়ার খানা পড়া আছে কিনা? ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ গোলমালে পড়লেন। জেলার একজন বিচারক হয়ে এসেচেন, শাসনের গুরুভার আপনাদের ওপর—অথচ জেলার জ্ঞাতব্য বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা না থাকলে শাসন কাজ চালান কি করে? আপনারা যাঁরা পাবলিক সার্ভেন্ট হয়েচেন তাঁরা যদি পাবলিক ইন্টারেষ্টে

আন্দাজে ঢিল ছুড়েন তবে আপনাদের শিক্ষাকে ধিক্… ভদ্রলোক লজ্জিত হলেন বোঝা গেল…দেশের শস্য আবাদ কোথায় কি রকম হয় তা' একটু জানা থাকা দরকার।

পিনাকী বোষ্টমী আর তার মেয়ে টিয়া এখন কোথায় আছে, বলতে পারেন? এ্যারেষ্ট ওয়ারেণ্ট দেবার আর লোক পেলেন না। বিক্রম দেখালেন শেষকালে মেয়ে-ছেলের ওপর। ভদ্রলোক সংকোচের সঙ্গেই বললেন: 'এ, ডাবলিউ' এখন আর আমরা পারত পক্ষে ইস্যু করি না, বিশেষ করে মেয়েছেলের ওপর ত নয়-ই, তবে এ ব্যাপারের রহস্যটা কোথায়? বললেন: রহস্য নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে—যা' আমিও সঠিক জানি না। তবে এ সম্বন্ধে শীগ্‌গীরই তদন্ত করে আমি আপনাকে জানাব। ধন্যবাদ দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামের লোকদেরও দু'চারটে সান্ত্বনার কথা বলে তবে ছুটী মিললো।

নবনী বলে: দেখুন, কি ভাবে আপনি নিজেকে এদের সুখে-দুঃখে জড়িত করে ফেলচেন! পরিবেশটি আমার সুবিধের মনে হয় না।

উৎসাহ বলে: এদের ব্যথা-বেদনার কাহিনী দিয়েই ত আমাদের জীবন। জাতির ইতিহাস রচনায় যেমনি এদের স্থান আছে, দুঃখ-বেদনারও তেমনি স্থান আছে। এদের

উপেক্ষা করলে নিজেকেই উপেক্ষা করা হবে। আজ তোমাদের ইস্কুলের খবর কি?

নবনী বলেঃ ইস্কুলের খবর আর বলবেন না, এদের ফাইভ ইয়ারস্ প্ল্যান কেন—টেন ইয়ারস্ প্ল্যান হোলেও হবে না···

উৎসাহ বলেঃ কেন, কোথায় ঘুণ ধরেচে সেটা খুঁজে বের কর!

নবনী বলেঃ খুঁজে আর বের করতে হবে না—কথায় বলে হাতে পাঁজি মঙ্গলবার···আমাদেরও হয়েচে তাই··· ছেলেরা আসবে না—ধান কাটাবার সময় পড়েচে, আবার কেউ কেউ বলে পাঠিয়েচে তাদের বাবার নিষেধ।

উৎসাহ বলেঃ বাবার নিষেধ কেন?

নবনী বলেঃ লেখাপড়া শিখলে বাবার পৈত্রিক ব্যবসা হাল ধরতে লজ্জা পায়···পরিবারের আর পাঁচজনের সুখ-দুঃখের দিকে নজর দেয় না···ছেলের মন উড়ু উড়ু হয়ে যায়···দশ-আনা ছ' আনা চুলের ছাঁট দিতে চায়···ফিন্‌ফিনে ধুতি জামা চাই···মাসে একবার শহরে গিয়ে সিনেমা দেখা চাই···লাভের চেয়ে স্বস্তি ভাল···লেখাপড়া শিখে দরকার নেই···জাত-ব্যবসা বজায় রেখে জীবন কাটাতে পারলেই যথেষ্ট আর ওসবে কাজ নেই আমাদের···

উৎসাহ বলেঃ তোমরা দেখচি অনেকদূর এগিয়ে

গেছ। আমি তোমাদের ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম ; কিন্তু এখন তোমরা যে স্তরে পৌঁছেচ সেখান থেকে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বেশ কষ্ট পেতে হবে আমায়।

নবনী বলে : তা' বেশ ত, আপনি আবার নিজেই সব ভার নিন না। আমি সত্যি কথা বলতে কি এ-কাজে প্রাণের যোগ পাচ্ছিনে নে···যে-দেশের লোকের মেণ্টালিটি এ-ধরণের সেখানে আমার মত লোক একা কি করতে পারে···

উৎসাহ বলে : কেন, নীলাও ত রয়েচে। এত সহজে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে চলবে কেন! প্রোপাগাণ্ডা আর পাবলিসিটিকে বাদ দিয়ে নীরস শিক্ষাদান করতে গেলে নিরক্ষর লোক একটু প্রথমে ভুল বুঝবেই ; কিন্তু সেটাই ত সব নয়···

নবনী এ প্রশ্নের আর কোন উত্তর দেয় না। প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত ধারাকে ব্যাহত করে এ ধরণের বন্দী জীবনে বৈচিত্র্য নেই। পল্লীর স্নিগ্ধ প্রকৃতি তাকে আকর্ষণ করে সত্যি, কিন্তু পল্লীর ক্ষুদ্র দলাদলি, স্বার্থবোধ তাকে পীড়িত কোরে তোলে। দূরের বিস্তৃত প্রান্তর, দুপুরে প্রাচীন বৃক্ষ সমূহের সুশীতল ছায়া, অপরাহ্নের সূর্যাস্ত, সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা-চুম্বকের দুর্নিবার আকর্ষণের মত প্রলোভিত

করে, কিন্তু আদর্শ জীবন যাপনের একটি আদর্শ কর্মতালিকা পায় না। অহেতুক দুঃখ ভারী পাথরের মত বুকে চেপে বসে। স্বীকার করে বাল্যে যে আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ তার সঙ্গে দেশীয় সমাজের বড় একটা যোগ নেই। দেশীয় সমাজে অত্যধিক পারিবারিক মমত্ববোধ জীবনে আদর্শ স্থাপনে বাধা দেয়। জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের দেশের ছেলেরা কেন যায় না পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পাশ্চাত্যের স্বাধীন দেশের মত। মেরু অভিযানের দুর্গম গিরি কান্তার আবিষ্কারের লোভ কেন হয় না আমাদের! সুখবাদের মহিমা আমাদের জানা নেই কেন? শুধু কি দুঃখবাদের চিরন্তন বেদনা উত্তরাধিকার সূত্রে অধিকার করব আমরা! কোথায় শান্তি, কোথায় সামঞ্জস্য ?

আট

নীলা বসে বসে শুধু ভাবে। সময় সময় বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। মনের নীরবতা পল্লীর নির্জনতাকে ছাপিয়ে ওঠে। এত বড় জীবনে এ-পৃথিবীতে এসে কি পেলাম— শুধু কি অপরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে গ্রহণ করাতেই মানব জীবনের মাহাত্ম্য ও মহত্ব প্রকাশিত হয়! নিজের ভিতরে যে প্রতিভা ছিল তাকে ছড়িয়ে দিতে পারতো বিশ্বের দিকবিদিকে—প্রতিভার কণ্ঠরোধে জীবনে এ হাহাকারের বেদনা প্রকট হয়ে ওঠে···যে মুষ্টিমেয় লোকের সুখ-সুবিধার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে চলেচে— এরাই কি জীবনের সব, না এর পরও জীবন আছে···

স্বার্থপর মানুষের সব কাজেই স্বার্থ আছে···স্বার্থ ছাড়া তারা এক পা-ও নড়ে না···ত্যাগে প্রকাশ পায় তার আত্মতৃপ্তির আনন্দ···কিন্তু সে কি তা' পেয়েচে···কিসের নেশায় সে পথ চলেচে? তার নিজের এ-আত্মত্যাগের মাঝে অপরের ব্যক্তিগত জুলুম আছে···এর সবটা যেন নিজের ইচ্ছেতে নয়, অপরের ইচ্ছে দিয়ে তার ইচ্ছেকে মোহাচ্ছন্ন করেচে···জীবনে ফাঁকির ভাগটাই বেশী করে পেয়েচে সে···আজ মনে হয় জীবনের এতগুলো দিন একটি

উদ্দাম নেশার ঘোরে পেরিয়ে গেচে—নেশার সময় মানুষের যেমন জ্ঞান থাকে না, সে-ও তেমনি এতদিন সুখে-দুঃখে মেশান পৃথিবীর মুহূর্তগুলো অতিক্রম করেচে, কিন্তু অনুভব করে হৃদয় দিয়ে যাচাই করে নিতে পারে নি··· সময় পেরিয়ে যায়···মানুষ একই দিনে হাসে, কাঁদে, গল্প করে—আবার নোতুনদিনে সব ভুলে যায়···কিন্তু মানুষ তার গভীরতম আনন্দের পরক্ষণটি ভুলে কি? না মানুষ তা' ভুলতে পারে না···কোলাহলের উত্তেজনায় আসল আনন্দের সবটুকু অবচেতন মনে সঙ্গোপন থাকে···নির্জন অবসরে স্মৃতির ফলকে যখন প্রতিফলিত হয় গত আনন্দময় মুহূর্তের চিত্রগুলো তখনই যথার্থ আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধি হয়···নীলা আনন্দময় ছবিগুলি পর পর সাজিয়ে যায়, কিন্তু তৃপ্তি পায় না···ক্রমশই জীবন দুর্বিষহ বিষাক্ত হয়ে উঠচে···মানুষ জীবনে আনন্দের খনিকে নিঃশেষে কুরিয়ে ফেলবার কতই না ফন্দি-ফিকির আঁটে।

নবনীর জীবনে কোন প্রোগ্রাম নেই। বিংশ-শতাব্দীর ছেলের পক্ষে এইটেই সব চেয়ে আশ্চর্য। মানুষটি ঠাণ্ডা, ধীর, স্থির। হুড়োহুড়ি নেই কোথায়ও। ভরতখালি এসেচে কিসের আকর্ষণে তা' সে-ই জানে। জীবনে কোন আদর্শের ভাবাবেগ আছে বলে মনে হয় না। একদিন

কথায় কথায় নীলার সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে একটা সাধারণ আলোচনা হয়। নীলা তা'তে জবাব দেয়ঃ নারীর বিবাহ অর্থ হচ্ছে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও স্বাধীনতার পায়ে আত্মাহুতি দেওয়া···নবনী এ প্রশ্নের আর কোনদিন উত্তর দেবার চেষ্টা করে নি। কেন যে করে নি তা-ও নবনীই জানে। নবনী সেদিন স্পষ্টই নীলাকে বলেচেঃ তোমাদের বড় বড় গালভরা কথা ক্লাশ-লেশ্‌ সোসাইটী, কিষাণ মজতুর, ইকনমিক্‌ সোসালিজম্‌ আমার আর ভাল লাগে না বাপু···তোমরা কেন, তোমাদের নাতীরাও ওসব কোনদিন দেখতে পান কিনা তাই আমার মনে সন্দেহ জাগচে··· ধনীকে নির্ধন করবে কম্যুনিষ্ট ভাইরা···ধন্য তাদের অভিযান, কিন্তু ধনী অর্থ দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকে আরও তীক্ষ্ণ করবে···ফল ঘটবে ইনটালেকচুয়াল লেবারের সঙ্গে ম্যানুয়েল লেবারের সিভিল ওয়ার···

নবনী এল।

নীলা বললেঃ তুমি কিন্তু অনেকদিন বাঁচবে, এক্ষুনি ভাবছিলাম তোমার কথা।

নবনী বললেঃ আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু মক্ষিরাণীর হাতের পরশ না পেলে অতিথিদের আহার্য পরিপূর্ণ হবে না···সারাটা দিন তারা অভুক্ত···তুমি কৃপা করলে তারা একটু জিরিয়ে নেবার অবসর পাবে···

ভরতখালিতে পৌঁচতে যে পথশ্রমের প্রয়োজন তা' তোমার অজানা নেই···

কোলকাতা থেকে সংকট-ত্রাণ-সমিতির ছেলেরা এসেচে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের সাহায্য করতে। সঙ্গে এনেচে অর্থ, কাপড়, চাল-ডাল। আগামী কাল থেকে তারা কাজে লেগে যাবে, আজ তাদের পূর্ণ বিশ্রাম। উৎসাহরা জমিদার এবং গ্রামের শীর্ষস্থানীয় ; সুতরাং এখানে এসেই কর্মীরা আস্তানা গেড়েচে !

ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ছেলেরা গ্রামের চারদিকে বেরিয়ে পড়ে। নবনী এদের কাণ্ড-কারখানা দেখে একটি বিশ্রী অস্বস্তির বোঝা গোপনে বয়ে বেড়াচ্চে। জন্মের হার যে দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেচে, তা'তে এধরণের পজেটিভ্ চেক্ হবেই। এদের সাহায্য করতে চাওয়া মানে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করা।

নবনী যৌবনের প্রায় প্রান্তসীমায় এসে পড়েচে। আধুনিক তারুণ্যের গতি ঠিক কোন্ খাতে প্রবাহিত হচ্ছে তার হদিশ্ পায় না। নোতুন দলের সঙ্গে বয়সের ব্যবধান ত মোটে বছর দশেকের—কিন্তু চিন্তাধারায় পার্থক্যটা বড় বেশী। তারা কি চায় আর কি না চায় তাই বোঝা যায় না···সন্ধিযুগের মানুষ বড় বর্ণচোরা···চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাদের অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা···নবনীর ধারণা এরা ভাববার

আগে কাজ করে এবং কাজ করার পরে ভাবতে বসে, সেজন্য সকল কাজেই এত চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা···

নবনীর ভরতখালিতে আর একদণ্ডও ভাল লাগচে না। দেশপ্রেমের নামে ভ্রাতা ও ভগিনীর উৎকট পাগলামি সহ্যাতীত হতে চলেচে। উৎসাহবাবু নিজের খেয়াল চরিতার্থতায় মশগুল। নীলা দেবী—তার ভাবনার নাগাল পাওয়া মানুষের সাধ্যাতীত। তিনি কি যে ভাবেন আর কি যে ভাবেন না সেইটেই ভাবনার বিষয়।

কোলকাতা থেকে ছেলেরা সাহায্য করতে এসেচেন, বেশ ভাল কথা; কিন্তু নীলা দেবী গ্রামের জমিদারের মেয়ে হয়ে মান ইজ্জত খুঁইয়ে মুচিপাড়ায় দান-খয়রাত করে বাহাদুরির লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। নীলা এ-কথা শুনলে হেসে উড়িয়ে দেবে, বলবে: বুর্জোয়া··· রক্ষণশীল মনোভাব পরিত্যাগ করো। কিন্তু, কেন? নারীর পক্ষে শোভন অশোভন আছে ত। সমাজকে মানি না বললেই মানি না। এই কি আর একটা কথা। এ আবহাওয়ায় মানুষ থাকতে পারে?

নবনী এখানে এসে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেচে নানান্ কাজে। সকালে বিনে পয়সায় রোগী দেখা ও ওষুধ বিতরণ। দুপুরে ইস্কুল। বিকেল প্রায়ই শিক্ষামূলক বক্তৃতা। সন্ধ্যেটা অবশ্যি ছুটী।

যাই বললেই যাওয়া চলে না। কাজ করব না বললেই কাজ ছেড়ে দেবে না। অসন্তোষ ঘনীভূত হলে কাজে শৈথিল্য প্রকাশ পাবে তাতে বৈচিত্র্য কি। বিছানায় শুয়ে শুয়েই স্থির করে ফেললে আজ আর কিছুতেই ঘর থেকে বেরুবে না।

উৎসাহ দেখতে এল শরীর অসুস্থ ভেবে।

নবনী বললে: দেহ সুস্থই আছে কিন্তু মন অসুস্থ।

উৎসাহ বললে: হঠাৎ মনের অসুখের নোতুন কোন কারণ ঘটলো নাকি?

নবনী বললে: মন আমার চিরকালই রুগ্ন। পেটেন্ট ওষুধের বিজ্ঞাপনের কুহক বড়, আসলে গুণ কম। আমার রুগ্ন মন তেমনি চিরটাকাল টনিকের লোভে ঘুরে মরে, কিন্তু কোন ফল পায় না। সব টনিকই ধাঁধাঁ লাগিয়ে আকর্ষণ করে, ফলের দিকে নজর দেবার অবসর দেয় না···

উৎসাহ সহাস্যে বললে: শরীর সুস্থ থাকলে উঠে পড়। তোমার অপেক্ষায় বাইরের অনেক লোক অপেক্ষা করচে···

নবনী গভীর ঔদাসীন্যের সঙ্গে জবাব দেয়: আমি না থাকলে কি হোত! চিরটা জন্ম যাদের ওষুধ না খেয়ে

চলেচে তাদের আর একদিন ওষুধ না খেলে কি হবে! হাতুড়ের ওষুধ খাওয়া না খাওয়া উভয়ই সমান···

উৎসাহ বললেঃ তুমি সমাজের শিক্ষিত ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি—তোমার কোন দায়িত্ব নেই বললে চলবে কেন? তোমার প্রতিভার উন্মেষ হবে তোমার দানের ব্যাপ্তিতে, হৃদয়ের প্রশস্ততায়, ত্যাগের মহিমায়···

নবনী বললেঃ দেখুন আপনি আমার থেকে বয়সে ছোট। ভাবী সম্পর্কের সম্ভাবনায় আপনাকে অগ্রজের সম্মান দিয়েচি···কিন্তু সত্যি বলচি পৃথিবীর উত্থান-পতনের দোদুল্যমান লাভ লোকসানে হৃদয়ের যোগাযোগকে আর খুঁজে পাইনে···

উৎসাহ বললেঃ বুঝেচি, তোমার মনটা প্রকৃতিস্থ নেই। কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। যাদের নিয়ে আমাদের কারবার তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা এত বৈচিত্র্যহীন, এত একঘেঁয়ে ও এত নীরস হয়ে ওঠে—যে দুদিনেই আমরা হাঁপিয়ে উঠি—বেশ ত তুমি যেতে চাও যাবে, কিন্তু এখন উঠে পড়···

নবনী বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে পড়ে।

বাইরে জনা পঁচিশ ত্রিশ লোক ওষুধের জন্য অপেক্ষা করচে। কার্তিকের প্রারম্ভ। শীতের আমেজ সুরু

হয়েচে। ঋতু-পরিবর্তনের সূচনায় গ্রামের ঘরে ঘরে অসুখ-বিসুখ। নবনী চট্‌পট্‌ ওষুধ দিয়ে সবাইকে বিদায় করে দিলে. কেবল এড়াতে পারলে না তিনটি লোককে। তাদের বাড়ীতে যেতে হবে।

ষ্টেথিস্‌কোপ্‌ হাতে নিয়ে নবনী বেরিয়ে পড়ে।

জীবনে শান্তি নেই, আছে শুধু বিষণ্ণতা। অতীতের নোংরামিকে সমর্থন করাতেই যদি জীবনের সত্য রূপ ফুটে ওঠে তবে সেখানে নবনী নেই। বহু জীবনের দায়িত্ব বইবার গুরুভার নবনী নিতে পারবে না। পথ বাতলাতে পারে কিন্তু তাই বলে পথ চলবার ভার বইতে পারবে না।

নয়

বাধ্যতামূলক কোন কাজই কৌস্তুভের ভাল লাগে না। বাধ্যতা কাজের মাধুর্যকে হারিয়ে দেয়। নিজের খুসীমত কাজ করলে প্রাণশক্তি অন্তরের অনুমোদন লাভে কাজের সহজ স্ফূর্তিকে মূর্তমান করে তোলে। কৌস্তুভ নিজের মনের কথা ভেবে নিজেই হেসে ওঠে: মেজাজটা যে-ভাবে গড়ে উঠেচে তা'তে রাজা হওয়া উচিত ছিল।

সদিন মিথিলেশ কথায় কথায় বলছিল: তোকে দেখে হিংসে হয় কৌস্তুভ…

কৌস্তুভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে উত্তর দিয়েছিল: হবার ত কথাই। ক্ষণে বেকার, ক্ষণে মাছিমারা কেরাণী।

মিথিলেশ বলে: চাকরিই কি জীবনের সব! চাকরীকে বজায় রাখতে গিয়ে হৃদয় হোলো মরুভূমি। হৃদয়কে ফাঁকি দিয়ে পাথিব সম্মানকে আঁকড়ে থাকা মানে জীবনকে ট্রাজিডির পথে এগিয়ে দেওয়া…তোকে দেখে হিংসে হয় অর্থাৎ হৃদয়ের ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করতে পেরেচিস্…প্রেমের রাজ্যে তুই পরমহংস…তুই ত মহা ধনী লোক…

কৌস্তুভ বলেঃ তুই আমাকে বুঝতে পারিস নি···অসীম দুঃখ, অনন্ত বেদনা, গভীর অপরিতৃপ্তির মধ্যে জীবন কাটচে আমার···মানুষ নিজের সবকিছুকেই খাট করে দেখে···

মিথিলেশ পকেট থেকে একটি নোট বই বের করে বলেঃ জাপানী কবি নোগুচিকে মনে পড়ে? শোন্ নোতুন করে আবার। পড়তে সুরু করেঃ ধরে নিই তুমি যদি বস্তুতান্ত্রিক হও তাহলে তুমি বলবে, বসন্তের ফুলগুলি আমাদের কি কাজে আসতে পারে? আকাশের চাঁদ যত উজ্জ্বলই হোক্ না কেন বিজলী বাতির কাজ তা' দিয়ে সম্ভব হয় কি? হয়ত জিজ্ঞাসা করবে, একটা ফুল বা চাঁদের ছবির সঙ্গে আমাদের জীবনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কি করে থাকতে পারে, আমার উত্তর এই—"এই ফুল,···এই চাঁদ আমাদের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা' কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? মনে কর আমরা যাকে ভালবাসা বলি, সেই ভালবাসা একটা বস্তু নয়, তা'কে হাতে ধরা যায় না, তবুও সকলেই জানে যে, একমাত্র ভালবাসা দিয়েই আমরা জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে পারি, যা' দেখতে পাই, যা' ধরতে পাই তার চাইতে এই ভালবাসার শক্তি অনেক অধিক।"···

কি বন্ধু, আশাকরি এখন স্বীকার করবে?

কৌস্তুভ বলে : ছেলেবেলা থেকেই তুই বড্ড বেশি রোমান্টিক। কলেজী জীবনের রেস্তোরাঁর কথা মনে পড়ে তোর···তখন থেকেই হৃদয়ের কারবার চালাচ্চিস্··· পেয়ালা পিরীচের ঠুনঠান্ শব্দের সঙ্গে 'উপল-বিষম গিরি-নির্ঝরের মতো' তোমার নায়িকারা 'সচঞ্চল ও উন্মুখর' হয়ে উঠতো···জীবনে প্রতিষ্ঠা পেলি কিন্তু হৃদয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হোলো না···

মিথিলেশ বলে : জীবনে দুঃখ সেইখানে। তুই ডুবে ডুবে জল খাস আবার উপোস-ও করিস্···তোর মাহাত্ম্য এইখানে···উপোসের ফলও হাতে হাতে পাস্ পাঠ্যজীবনে উৎসাহের বোন···পরবর্তী জীবনে রুমা দেবী···আরে, বিলেত থেকে পিছু নিয়েচি তবু মন পেলাম না···

কৌস্তুভ গায়ের লেপটিকে ভালভাবে টেনে দিয়ে পুনরায় চোখ বুজবার চেষ্টা করে···লেপের নীচে শুয়ে শুয়ে এসব কথা ভাবতে মন্দ লাগে না···বিছানায় ঘুমিয়ে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ ঘুমের আরামকে ঠিক উপলব্ধি করা যায় না···ঘুমের পরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যে-চিন্তা সেখানেই শোবার আনন্দ···এক এক দিন মনে হয় দিনের বেলা গুরু পরিশ্রমের পর যখন বিছানায় শোবা মাত্র রাত ভোর হয়ে গেচে···আবার তক্ষুনি কাজে বেরুতে হবে···

এমন ঘুমে যেন তৃপ্তি নেই···বিশ্রামহীনতার চিহ্ন চোখে-মুখে সাক্ষ্য দেয়···শ্রান্তির গ্লানি সমস্ত দিন বয়ে ফিরে···

ঘুম আর আসে না। মনে মনে দিনের কাজের একটা খসড়া করে ফেলে। সকালে প্রাত্যহিক কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রুফ কপিগুলি দেখা শেষ করতে হবে। অনেক দিন হয়ে গেল। এখন তাড়াতাড়ি না প্রকাশ করতে পারলে বিষয়-বস্তু যুগের খাতিরে অব্‌সোলীট্‌ হয়ে পড়বে। তারপর আফিস। আফিস থেকে সোজা রুমা দেবীর বাড়ীতে। ভাল কথা ত্ু'দিন ছুটী নিতে হবে। রুমা লিখে পাঠিয়েচেন কোথায় যেন পাঠাবেন। সঙ্গে বিশেষ কিছুই নিতে হবে না, একেবারে আফিস ফেরৎ চলে যেতে লিখেচেন।

এসোসিয়েটেড্‌ প্রেস ও য়ুনাইটেড্‌ প্রেসের টুকরো টুকরো সংবাদগুলো তর্জমা করতে করতে কোথা দিয়ে সময় চলে যায় টের পায় না। ত্ুদিনের ছুটীও মঞ্জুর হয়েচে। ঠিক আছে। এই ত পাঁচটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকী।

* * * *

কৌস্তভের খাওয়া শেষ হলে রুমা দেবী বললেন: আপনাকে আজ মেদেনীপুর যেতে হবে। জামাকাপড় এই স্যুটকেশে আছে। এক সেট্‌ কমপ্লিট্‌ স্যুট, এক সেট্‌ কাবুলি পোষাক মায় দাঁড়ি গোঁপ ও ফোল্ডিং লাঠি সমেত,

আর আত্মরক্ষার অস্ত্র। ছোট স্যুটকেশ কিছুই অসুবিধে হবে না—নিজেই বগলদাবা করে নিয়ে যেতে পারবেন···

আসল কাজের কথাই বলা হয় নি। ওখান থেকে একটি মেয়েকে এস্‌কর্ট করে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসবেন। স্টেশনে পৌঁছুলেই আমাদের দলের লোক সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করবে। আপনি তার অনুসরণ করবেন। তারপরের ব্যবস্থা উপস্থিত বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্ন-মতি খাটিয়ে স্থির করতে হবে···আর কাকেও একাজ দিয়ে ভরসা পাইনে···আপনিই একমাত্র লোক যিনি একাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারবেন।

কৌস্তুভ ভিতরে ভিতরে হাঁফিয়ে ওঠে। এ-কোন্ গুরুভার অপ্রত্যাশিতভাবে তার দুয়ারে নোতুন করে এসে হানা দিল। রুমা দেবীকে এতদিন অহিংস-কর্মী বলেই সে জানতো, কিন্তু তিনি যে বিপ্লবী-সঙ্ঘেরও একজন পাণ্ডা একথা মুহূর্ত পূর্বেও তার জানা ছিল না। বিপ্লববাদে কৌস্তুভের বিশ্বাস নেই ; বরং মনে মনে ভয়ই করে। কিন্তু এখন এতদূর অগ্রসর হয়ে যদি অস্বীকার করে বলে আমি যাব না তবে কাপুরুষতাই প্রকাশ পাবে। একবার ভাববারও অবসর পাবে না। সবই প্রস্তুত, এখনই রওনা হতে হবে।

রুমা দেবী কৌস্তুভকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে :

ভয় পেলেন নাকি ? ভয় পেলে ত চলবে না···অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েচেন, আগুন দেখে ভয় পেলে চলবে না··· জানেন ত দেশকে ভালবাসলে জীবনের মায়া করলে চলে না···দেশকে ভালবাসা ত পাপ নয়···যে-যত ভাল ছেলে সেই তত দেশকে ভালবাসে···আমরা যাকে ভাল ছেলে বলি তারা ভাল ছেলে নয়···

কৌস্তুভ বিস্ময়ে অবাক হয়। ভাষার সারল্যে এমন গভীর কথাও কত সহজ হয়ে পড়ে। মনে যে দ্বন্দ্বের গ্লানি উপস্থিত হয়েছিল তা' মুহূর্তে অপসারিত হোলো। বিপদ নিয়েই মানুষের জীবন। বিপদকে ফাঁকি দেবার কৌশল শিক্ষাতেই মানুষের কৃতিত্ব।

কৌস্তুভ বেশ সাহসের সঙ্গেই জবাব দেয়ঃ না, না, ভয় পাব কেন ? ভয় করবার এতে কি-ই বা আছে ? একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসা বইত নয়···

রুমা দেবী একটু মৃদু হেসে জবাব দিলেনঃ ঠিক মেয়ে ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু সে যেমন তেমন মেয়ে নয়···বংশমর্যাদায় সে কুলীন, অতীতের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধবান···জাতে নয় দেশ-সেবায়···পিতা ও ভ্রাতার কাছে সে মানুষ···আজ তাঁরা পৃথিবীতে নেই···দেশের ইতিহাসে একদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাঁদের নাম···

কৌস্তুভ একবার হাই তুলে গা' মোড়ামুড়ি দিয়ে জিগগেস্ করলে : নামটি শুনতে পাই কি ?

রুমা দেবী ঠাট্টার সুরে বললেন : নামের মোহ আছে নাকি আপনার ? নাম তার পম্পা। পম্পাই নগরীর ধ্বংসাবশেষের মতই তার বংশগৌরব আজ ধ্বংস-স্তূপে চাপা পড়েচে···

কৌস্তুভ একটু ঘুরে বসে বলে : নেহাৎ অভদ্র প্রশ্ন, তবু জিগগেস্ করচি···মেয়েটি লেখাপড়া কিছু করেচেন কি ?

রুমা দেবী বললেন : হ্যাঁ, আপনাদের কালেজীপড়াও কিছু পড়েচেন। তা' ছাড়া দেশের কাজে যাঁরা নাবেন তাদের পড়াশোনা সাধারণের থেকে একটু ভিন্ন রকমের হয়···তাদের দৃষ্টিভঙ্গী থাকে উঁচু দরের···তাদের পাঠে সংকীর্ণতার স্থান নেই।

কৌস্তুভ বাইরের মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ মেশেনি। বাইরের বলতে নীলা আর রুমা দেবী। উভয়েই অন্তরে সুরের রাগিনী সৃষ্টি করেচে। ভাবচে : ইনি না জানি আবার কোন নোতুন ছন্দের সূচনা করেন। প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা মেলামেশার অভাবে প্রথমে যার সঙ্গে পরিচয় হয় তাকেই ভালবেসে ফেলে—সৌন্দর্যের বিচার করবার অবসর পায় না।

রুমা দেবী বলেন ঃ কি চুপ করলেন যে বড়…একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন কৌস্তুভবাবু…দেশের কাজে নারী পুরুষের সম্বন্ধটা যত ভুলে যাওয়া যায় ততই দেশের ও নিজের মঙ্গল…

কৌস্তুভ চমকে ওঠে। রুমা দেবী থট্ রিডিং জানেন নাকি…যেমনি ভাবা আর অমনি ধরে ফেলেচে…কৌস্তুভ তার কথাগুলো অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলে ঃ বটেই ত, বটেই ত।

রুমা দেবী বলে ঃ নিশ্চয়ই। আপনার যাবার সময় হয়ে এল, আর দেরী নয়। যান পোষাক পরে প্রস্তুত হয়ে নিন। ফাষ্ট ক্লাসেই যাবেন…এই ধরুন টাকা…

ড্রেসিং রুমে মুহূর্তে নিজেকে য়ুরোপীয় পোষাকে আবৃত করে বড় আর্শির দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে। চেহারাটা নেহাৎ মন্দ নয়। তীব্র বৈদ্যুতিক আলো আয়নায় প্রতিফলিত চেহারার ঔজ্জ্বল্য আরও বাড়িয়ে দিলে।

ফেলট্ হ্যাটটি মাথায় দিলে। চোখে দিলে রিমলেশ চশমা। হাতে নিলে ষ্টিক। মুখে দিলে পাইপ। যখন বেরিয়ে এল রুমা দেবী বললে ঃ ঠিক আমেরিকান টুরিষ্টদের মত দেখাচ্ছে…বেশ মানিয়েচে আপনাকে…

গেটের কাছে মোটরে উঠিয়ে দিতে চললেন রুমা

দেবী। এমনি সময় পার্ক করে মিথিলেশের গাড়ী ; মিথিলেশ বলে : হ্যালো কৌস্তুভ! সাহেব সেজে চল্‌লি কোথায় ?

কৌস্তুভ রুমা দেবীকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। মুখে কোন কথা বললে না। ভাবটা এই রকম : ওকেই জিজ্ঞাসা কর না তাহলেই প্রশ্নের উত্তর পাবে।

দৃষ্টির বাইরে চলে যায় কৌস্তুভের গাড়ী। কৌস্তুভের মনে হলো কেউ যেন তাকে ফলো করচে।

মিথিলেশ রুমাকে প্রশ্ন করে : কৌস্তুভকে সাহেব সাজিয়ে পাঠালে কোথায় ?

রুমা নির্লিপ্তভাবে জবাব দেয় : আমি পাঠাব মানে···তিনি এখানে এসেছিলেন যেমনি তুমি এখানে এসেচ···আবার চলেও গেলেন যেমনি তুমিও চলে যাবে···

মিথিলেশ বলে : ছলনা কোরো না···কৌস্তুভকে ত আমি জানি···সাহেব সাজার ছেলে সে নয়···নিশ্চয়ই তুমি কোথাও পাঠিয়েচ···

রুমা বলে : তোমার কল্পনাতে বাধা দিয়ে তোমার সুদূরপ্রসারী কল্পনার ব্যাঘাত জন্মাব না···যা' খুসী তুমি ভাবতে পার···

মিথিলেশ বলে : দুঃখ হয় রুমা, আমার কাছ থেকে কেবলি তুমি গোপন করতে চাও···কৌস্তুভও তোমার কাজে লাগতে পারে, আর আমি কি এতই অকর্মন্য তোমার কোন কিছু উপকারেই আসতে পারি না···

রুমা বলে : কেন, কৌস্তুভের চেয়ে নিজেকে খুব উঁচুদরের ভাব নাকি···এতটা অহঙ্কার থাকা ভাল নয়···চাকরি ছাড়া তোমার কি গুণ আছে বল···

মিথিলেশ বলে : চাকরিটাকে তুমি বড্ড ছোট করে দেখলে···এই চাকরি দিয়ে আমি মান, সম্মান, ঐশ্বর্য সবই পেয়েচি···পাইনি কেবল তোমার মন···

রুমা বলে : এতদিন জানতাম চাকরী করে মান ইজ্জত বাড়ায় ভোজপুরী দরোয়ান···আর তোমাকে দেখচি চাকর হয়ে মান বাড়াতে পেরেচ···মন পেতে চাও চাকরীটা ছাড়তে পার আমার জন্য ?

মিথিলেশ বলে : রুমা তুমি বলচ কি ? তুমি নিশ্চয়ই প্রকৃতস্থ নেই···চাকরী গেলে আমাকে পুছবে কে ?

রুমা বলে : আমি প্রকৃতস্থই আছি। চাকরী গেলে তোমাকে পুছবে দেশের লোক।

মিথিলেশ বলে : কিন্তু সে চাঞ্চল্য ক'দিন ? মুহূর্তেই উবে যাবে। আমি আবার বোনাফাইড্ ভেগাবণ্ড···

রুমা বলে: তখন তুমি আবার মানুষ হবে। নিজের মনুষ্যত্ব ফিরে পাবে। যদি তোমার ভিতরে সত্যকারের কোন পদার্থ থাকে তবে তারই বিকাশ হবে…

মিথিলেশ বলে: বাস্তব জগত সম্বন্ধে তোমার আইডিয়া নেই। জীবনে অর্থের প্রয়োজন যে কত তা' কি তুমি জান না!

রুমা বলে: কিছু আইডিয়া আছে বলেই ত বলচি। মাইনে এখনও হাজারের ঘরে যায় নি…তুমি আমার শাড়ীর খরচ জুটোতে পারবে? বেবী হলে ব্যাঙ্কে কত জমা দিতে পারবে?

মিথিলেশ বলে: তোমার টাকা কি আমার টাকা নয়, তোমার ত আছে, তা' দিয়ে কি চলবে না আমাদের…

রুমা বলে: পথে এসো, তবে যে বড় চাকরীর বড়াই করছিলে…

মিথিলেশ বলে: মাইনে আমার আজ না হোক্ দু'দিন পরেই ত বাড়বে…

রুমা বলে: চাকরী নিয়ে তোমার দাম্ভিকতা প্রকাশ করো সোসাইটি গারলস্‌দের কাছে…

মিথিলেশ বলে: কেন, তুমি কি তার বাইরে…

রুমা বলে: আর কোন কাজের কথা থাকে ত

সেরে ফেল চট্ করে—আমার অনেক কাজ পড়ে আছে…

মিথিলেশ: সত্যিই কি তোমার সময়ের এত অভাব…

রুমা বলে: কেন মিছেমিছি বিরক্ত করচ বাপু…কাজ না থাকে সরে পড়…

মিথিলেশ বলে: এই কি তোমার শেষ কথা…

রুমা বলে: শেষ কি প্রথম জানি নে…তবে আপাততঃ এই শেষ…

মিথিলেশ কণ্ঠে হতাশের স্বরে বলে: তবে আমি এখন আসি…

রুমা বলে: এসো…প্রেম করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে প্রেমের জন্য হতাশ হয়ো…তবেই খুসী হবো…

* * * *

পম্পা।

অষ্টাদশী। দ্বিতীয়ার একফালি চাঁদের মত ভ্রূ-যুগল। লিপ্‌ষ্টিক্, রুজ্ ও কিউটেকসের ছড়াছড়ি। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ; কিন্তু তা'তে সাজঘরের উপাদান নেই, আছে আত্মরক্ষার ছোট্ট একটি অস্ত্র। অতিশয়োক্তি নয় —গায়ের রংএর ঔজ্জ্বল্য প্রথম শ্রেণীর তীব্র বৈদ্যুতিক আলোকেও যেন নিষ্প্রভ করে দেয়।

ছোট্ট কামরা। একটিমাত্র বেঞ্চ। পাশাপাশি দুজনে বসে চলেচে। শীতের ওজুহাতে জানলা দরজা রুদ্ধ। মনে হলো ট্রেণখানি কোন একটি ষ্টেশনে এসে থামলো। প্ল্যাটফরমে সশব্দ বুটের সমবেত পদধ্বনি উভয়কে সচকিত করে তোলে। একে অন্যের মুখের দিকে তাকায়। ভাবটা: এই বুঝি এলো; শত্রুপক্ষ বোধহয় টের পেয়েচে।

আবার ট্রেণখানি ধীরে ধীরে চলতে সুরু করে। দুজনেরই মুখে ফুটে ওঠে জয়ের হাসি, বিজয়ের আভাস।

কৌস্তুভ বলে: আপনি বোধহয় কখনও কোন অন্যায় করেন নি……

পম্পা হেসে বলে: কি রকম? অন্যায়ের ভিতরেই আমাদের জন্ম…দেশ আমাদের সইতে পারে না…আমরা যেদিকে যাই, সেদিকেই বিপদ ঘনিয়ে আসে…

কৌস্তুভ বলে: আচ্ছা, একদিন আগেও আপনি চিনতেন না—আমি ছিলাম নেহাৎ অপরিচিত…কেমন, তাই না?

পম্পা বলে: ঠিক। প্রথমে সবাই অপরিচিত থাকে…

কৌস্তুভ বলে: এই যে নিঃসংকোচে আপনি আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন, আপনার ভয় করলো না…

পম্পা তার কথাগুলিতে শিশুর সারল্য দিয়ে বলে যায়ঃ ভয় কেন? আপনাকে ভয় করবে কেন? আপনি বাঘ না ভালুক! আপনি এসেচেন আমাকে পরিত্রাণ করতে, আপনাকে ভয় করবে! আপনি কি বলচেন?

কৌস্তুভকে কে যেন চাবুক মারলে। কি সহজ বিশ্বাস, কি উদার ও অনাড়ম্বর মনোভাব, কি অকপট নির্ভরশীলতা···ফুলের ঋজুতা অন্তরে ঘর বেঁধেচে···

কৌস্তুভ বলেঃ দেশ-মাতৃকার নিষ্ঠুর রক্ত লালসায় দুঃখ হয়···আপনাদের মত যারা দেশ ও সমাজের গৌরব-স্বরূপ তাঁদের রক্ত না হলে মা' তৃপ্ত হবেন না···মায়ের আমাদের ভুখার শেষ নেই···রক্ত উপঢৌকন দিয়ে যদি মঙ্গলকে পেতে হয়, তবে সে-পাওয়ায় সুখ নেই···

পম্পা ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে বলতে সুরু করেঃ আপনি একটু ভুল করচেন···মা' আমাদের কাছে কিছু চান না, তিনি সর্বদাই নীরব···মা' অতি নির্লোভ···বলতে নেই, আমরা যারা তাঁর অঞ্জলির পুষ্প হতে পেরে নিজেকে ধন্য করবার সুযোগ পেয়েচি, তারা আর নোতুন করে কোন অভিযোগের অবসর পায় না।

কৌস্তুভ বুঝলে, অকপট ভক্তের অভিযোগহীন নীরব

আত্মসমর্পণ, বললে : আপনারা যাঁরা দেশকে ভালবেসে দুঃখকে আঁধার রাত্রির সঙ্গী করে নিয়েচেন, তাঁরা আমার মত লোকের কাছে চিরনমস্য।

পম্পা লজ্জিত হয়ে বললে : আপনি আমাকে বড্ড বাড়িয়ে তুলচেন। এতটা বাড়াবাড়ির কিছু নেই! আপন আপন ক্ষুদ্র শক্তিতে মানুষ মাত্রেই দেশকে অল্পবিস্তর ভালবাসে···তারই প্রকাশ কৌশলে মানুষ স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে দেশ-প্রেমের সামাজিক মর্যাদা আদায় করে··· শিল্পীর আনন্দ যেমনি ক্ষণিকের বস্তুকে চিরন্তন বন্দীত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবার কৌশল আয়ত্ত করে, তেমনি দেশমাতৃকারও···

কৌস্তুভের চোখ দুটি ঘুমে জড়িয়ে আসে। নেশা-খোড়ের মত মাথাটা একবার দোল খেয়ে ওঠে···

পম্পা কৌস্তুভকে ঘুমোতে দেখে চুপ করে যায়।

কৌস্তুভ হঠাৎ মাথা তুলে পম্পাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে : কি চুপ করলেন যে বড়···

পম্পা হেসে বললে : আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন···ঘুম পেয়েচে যখন···

কৌস্তুভ অভিযোগের সুরে বললে : না, না—আমি শুনচি···আপনি ভেবেচেন আমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েচি···

পম্পা বলে : তা' ভাবব কেন? আমি বুঝতে

পেরেচি আপনি ঘুমোন নি। তবে এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন…ঘুম ত সত্যি সত্যিই পেয়েচে…

কৌস্তুভ লজ্জা পেল। সামান্য একটা কথায় একটি ছোট্ট মেয়ের কাছে শেষে হার মান্‌তে হলো।

বললে: কি বলচেন? ঘুমোব কি? আমরা ত প্রায় এসে পড়েচি।

পম্পা বললে: তা' বটে।

হাওড়াতে পৌঁচে রুমা দেবীর বাড়ীতে নির্বিঘ্নে পম্পাকে পৌঁচে দেয়। পথে যথেষ্ট ভয় ছিল; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় কোন বিপদেই পড়তে হয় নি। মেসে গিয়ে শোবার আগে ঘড়িটি দেখলে। রাত দু'টো।

বিছানায় শুয়ে নিজের অজ্ঞাতেই হাত দুটো গিয়ে কপালে জোড়া হয়ে ঠেকে—নিজেই আবার হেসে ওঠে—এ কিসের প্রণতি—যাক্ একটা মস্ত বড় ফাড়া কেটে গেল—অন্ততঃ এ-যাত্রার মত…

সকালে ঘুম থেকে যখন নিরুৎসাহ মন নিয়ে ওঠে তখন দেখে মেসের চতুর্দ্দিক লাল পাগড়ীতে ছেয়ে গেচে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। তবে কি পুলিশ সবই টের পেয়েচে। টের পেলে পথে ধরলে না কেন?

ওয়ারেণ্ট দেখে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস বেরুল। ভেবেছিল: গতকালকার ব্যাপারেরই জের; কিন্তু আসলে

তা' নয়—প্রেস্ আইন। প্রেস্ আইন বাঁচিয়ে লেখাটা এখনও রপ্ত করতে পারেনি দেখে মনে মনে দুঃখ পেলে। সামান্য একটু মনোযোগের অভাবে মিছেমিছি কারাপ্রাচীরের অন্তরালে সময় ক্ষেপণ করতে হবে—এর চাইতে দুঃখের আর কি আছে—পৃথিবীর উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে না—এ-পৃথিবী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক স্বতন্ত্র জগতে বাস করতে হবে—যেখানে মানবতা লাঞ্ছিত, হৃদয়ের কোমলবৃত্তি শুষ্ক, পশুর চাইতেও নির্মম—সেই কারাপ্রাচীরে জড়দেহের নির্বাসন···

রুমা দেবী ইনিয়ে বিনিয়ে নীলাকে চিঠি দিলে কৌস্তুভের দুঃসংবাদ দিয়ে। চিঠিতে মন্তব্য করতেও ছাড়ে নি। প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিটি পড়েই রুমা কৌস্তুভকে নাকি বলেছিল, বড্ড বেশী জোরাল হয়ে গেল। কৌস্তুভ একথাতে কাণ দেয় নি···সুতরাং দোষটা সম্পূর্ণ একা

নীলা রেগেই আগুণ। মুখ দিয়ে অস্ফুট ভাবে বেরিয়ে আসে, ননসেন্স। তোমার জন্যই কৌস্তুভের আজ এই কারাভোগ। তুমিই তাকে নাচিয়ে ফিরেচ। এখন সাধু হবার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করেচ

তোমার কৈফিয়ৎ শুনতে চায় কে? মেয়েজাতটা কি স্বার্থপর! কেন মিথিলেশবাবুকে পাঠালে ভাল হতো না?

উৎসাহ বললে: কার চিঠিরে···

নীলা চিঠিটা এগিয়ে দিলে দাদার দিকে।

আগাগোড়া চিঠিখানা পড়ে উৎসাহ বললে: চল আজ রাতেই কলকাতা যাওয়া যাক্···সব ঠিকঠাক করে নেও···

রাত্রির অন্ধকারের বুক চিরে ক্ষণপ্রভা যেমন পথিকের যাত্রাপথ মুহূর্তের জন্য আলোকিত করে পুনরায় নিশীথিনীর ভ্রমর কৃষ্ণরূপের গভীরতা বাড়িয়ে দেয়, ঠিক তেমনি নীলাও কোলকাতা যাত্রার নামে ক্ষণেকের জন্য আলোর রশ্মি দেখতে পায় বটে, কিন্তু মনের কোণে ভবিষ্যতের করাল মূর্তির যে ছায়াছবি ফুটে ওঠে তা'তে শুধু বড় বড় দু'টি অশ্রুর ফোঁটা নিজের অজান্তিকেই বেরিয়ে আসে।



শিশির সেনের

ছোট গল্পের বই

কালচারড্

বিষয়বস্তু, ঘটনার ঘাত-সংঘাত ও বর্ণনাবৈচিত্র্যে অপূর্ব। বস্তির মেয়ের প্রেম থেকে সুরু করে অভিজাত ঘরের কলেজী মেয়ের প্রেমের সুর-বৈষম্যের রোমাঞ্চ···মানব-গোষ্ঠীর ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে প্রেমের স্থান কোথায় ?